আদর্শ নারী
সুশীলা

ওঁ

শ্রীপরমাত্মনে নমঃ

আদর্শ নারী সুশীলা ।

(১)

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাতে মানুষের নিজ-কল্যাণের জন্য দৈবী সম্পদ ধারণ করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে (১৬/৫) । কাজে কাজেই দৈবী সম্পদে বর্ণিত সদ্‌গুণ-সদাচারসমূহ অমৃত তুল্য মনে করে কল্যাণকামী মানুষের পক্ষে তা পালন করা উচিত। গীতাতে ষোড়শ অধ্যায়ের প্রারম্ভেই প্রথম তিনটি শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সদ্‌গুণ সদাচারের সার হিসেবে নিম্নলিখিত ছাব্বিশটি লক্ষণের উপদেশ দিয়েছেন –

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্ ।।
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্ ।
দয়া ভুতেষ্বলোলুপ্তং মার্দবং হ্রীরচাপলম্ ।।
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা ।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ।।

(১) নির্ভীকতা, (২) পূর্ণ-চিত্তশুদ্ধি, (৩) তত্ত্বজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে ধ্যানযোগে নিরন্তর দৃঢ়রূপে অবস্থিতি, (৪) সাত্ত্বিক দান, (৫) ইন্দ্রিয়-সংযম, (৬) ভগবান, দেবতা, গুরুজনাদির পূজা এবং অগ্নিহোত্রাদি উত্তম কর্মের অনুষ্ঠান, (৭) শাস্ত্রাদির পঠন-পাঠন ও ভগবদ্‌নাম-গুণকীর্ত্তন, (৮) স্বধর্ম পালনজনিত কষ্ট সহন, (৯) ইন্দ্রিয়সূহের এবং অন্তঃকরণের সরলতা, (১০) কায়মনোবাক্যে কাউকে কোনও রকম কষ্ট না দেওয়া, (১১) প্রিয় এরং যথার্থ ভাষণ, (১২) অপকারীর প্রতিও ক্রোধের উদ্রেক না হওয়া, (১৩) কর্মে স্বার্থ এবং কর্তৃত্বের অভিমান-অহং-ত্যাগ, (১৪) অন্তঃকরণের উপরতি অর্থাৎ চিত্তচাঞ্চল্যশূন্যতা, (১৫) পরনিন্দাবর্জন, (১৬) সমস্ত জীবে অহেতুক

দয়া, (১৭) বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ হলেও ইন্দ্রিয়সমূহের সেই বিষয়ে আসক্ত না হওয়া, (১৮) কোমলতা, (১৯) লৌকিক ও শাস্ত্র-বিরুদ্ধ আচরণে লজ্জা, (২০) ব্যর্থ চেষ্টার অভাব, (২১) তেজস্বিতা, (২২) ক্ষমা, (২৩) ধৈর্য্য, (২৪) শৌচ - বাহ্যশুদ্ধি (২৫) জিঘাংসা-রাহিত্য এবং (২৬) নিজের প্রতি পূজ্যতার,অভিমানের অভাব,- হে অর্জুন, এইসব হল দৈবীসম্পদজাত মানুষের লক্ষণ।

দৈবীসম্পদের এই ছাব্বিশটি সদ্‌গুণ আয়ত্তের জন্য প্রত্যেক ভাইবোন যাতে কিছু পথের দিশা পায়, সেই উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে একটি কাহিনী বলা হচ্ছে —

প্রয়াগে দেবদত্ত নামে একজন বিদ্বান, সরলস্বভাব, সদাচারী এবং ঈশ্বরানুরাগী ব্রাহ্মণ বাস করতেন । দেশের শাসক সমাজেও তাঁর প্রচুর সম্মান ছিল। তাঁর স্ত্রী গৌতমীও খুব সাদাসিধা, সরল, আত্মভোলা কিন্তু নিরক্ষর ছিলেন। গৌতমী এক, দুই সংখ্যা গণনাও করতে জানতেন না। এদের তিন ছেলে ও এক মেয়ে। ছেলেদের নাম সোমদত্ত, রামদত্ত ও মোহনলাল। তিন ছেলেই সুশিক্ষিত ও সদাচারী। মেয়ের নাম ছিল রোহিনী। সকলেরই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। রোহিনী অল্প বয়সে নিঃসন্তান অবস্থায় বিধবা হয়ে পিতৃগৃহেই বাস করতেন। ছেলের বৌয়েদের নাম রামদেবী, ভগবানদেবী এবং সুশীলা। এদের মধ্যে প্রথম দুজন নিরক্ষর ও মূর্খ ছিলেন কিন্তু সুশীলা অতি বিদুষী এবং নিজের নামের মতই শীলবতী ছিলেন — শান্ত, সদ্‌গুণ-সদাচারী, ঈশ্বরানুরাগী আর পতিব্রতা। সবরকম কাজকর্মে তিনি দক্ষ এবং পারদর্শী ছিলেন। সুশীলা সেলাই-ফোড়াই, কাটা-ছাঁটা, সূচিকর্ম, বয়নকর্ম, সুন্দর. হস্তাক্ষরের অধিকারী এবং চিত্রকলা ও অন্যান্য শিল্পকর্মে অত্যন্ত নিপুণা ছিলেন। তার মধ্যে ত্যাগ, সেবা, ধৈর্য্য এবং কর্মকুশলতা গুণ বিশেষভাবে বিদ্যমান ছিল। সুশীলা শ্বশুর বাড়ীতে আসার সাথে সাথে সে বাড়ীতে সবকিছুই সুশৃঙ্খল ভাবে হতে আরম্ভ করল। নিঃস্বার্থ সেবার দ্বারা তিনি সকলকেই আপন করে নিলেন। তার যথাযোগ্য সুমিষ্ট ব্যবহার সকলকেই প্রীত করত।

সুশীলার ব্যবহারে বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা, ছোটদের ওপর স্নেহ মমতা আর সমবয়সীদের প্রতি বন্ধুত্ব প্রতিফলিত হত। তার নিপুণ কাজকর্মে ও সুশীল ব্যবহারে বাড়ীর লোকেরা ত সন্তুষ্ট থাকতেনই উপরন্তু সেই অঞ্চলের পাড়াপড়শীরাও তার গুণে মুগ্ধ হয়ে সর্বদা তার প্রশংসা করত। বয়সে নবীনা ও নববধূ হওয়া সত্ত্বেও সুশীলার সুখ্যাতি এতদূর বিস্তৃত হয়েছিল যে দুর দূরান্তর থেকে অনেক স্ত্রীলোক তার কাছে পরামর্শ ও শিক্ষা নিতে আসত।

পণ্ডিত দেবদত্তজী রোজ নিয়মিত রূপে সন্ধ্যা, গায়ত্রী, পূজাপাঠ, জপধ্যান করতেন, তিনি উপদেশাদি, ব্যাখ্যান ও অধ্যাপনার দ্বারা সংসার প্রতিপালন করতেন । বড় দুই ছেলে শহরে ব্যবসা-বাণিজ্য করে উপার্জনের সবটাই বাবার হাতে তুলে দিত। ছোট ছেলে মোহনলাল কলেজে পড়াশুনা করত। সংসারের খাওয়া খরচ বাবদ দেবদত্তজী প্রতি মাসে প্রয়োজনীয় অর্থ স্ত্রী গৌতমীকে ধরে দিতেন। গৌতমী সেই টাকা ঠাকুর চাকরকে দিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিষ আনিয়ে নিতেন। গৌতমীকে ভাল মানুষ পেয়ে ঠাকুর ও চাকর দুজনে মিলে চুরি করত আর তাকে ঠকাত। তারা যে জিনিষের যা দাম বলত গৌতমী সরল বিশ্বাসে তাই দিয়ে দিত। সংখ্যা গণনা না জানাতে গৌতমীর টাকা-পয়সাও ঠাকুর চাকরেরাই গুণত। এরা টাকা নিয়ে যেত আর অল্প জিনিষ এনে বলত যে সব টাকা খরচ হয়ে গেছে। কখনও মুখে মুখে কিছু হিসাব দিত, কখনও তাও দিত না, দিলেও গৌতমী কিছুই বুঝতেও পারত না।

বুদ্ধিমতী সুশীলার পক্ষে ওদের চুরি যোচ্চুরি বুঝতে বেশী সময় লাগল না। সে ভাবল যে আমার শ্বাশুড়ীব সরলতা এবং আত্মভোলা চরিত্রের সুযোগ নিয়ে এরা আমার সংসার লুঠ করে নিচ্ছে, এর একটা বিহিত দরকার। কিছুদিন পরে সুশীলা একদিন পাচক ঠাকুরকে বলল, "মহারাজ, আপনি চাল, ডাল, তেল, নুন, তরিতরকারী, মশলাপাতি যে সব জিনিষ বাজার থেকে কেনেন তার একটা হিসেব রাখা দরকার," পাচক ঠাকুর রেগে গিয়ে বলল, "বাব্বা! খুব ত হিসেব

নিতে শিখেছ দেখছি, এ বাড়ীতে সব কাজকর্ম বিশ্বাসের ওপর চলে। তোর শ্বাশুড়ীর এত বয়স হয়ে গেল, একদিনের জন্যও সে কখনও হিসেব চায়নি আর তুই কালকের ছোকরী, ঘরের লোকের কাছে হিসেব চাইতে এসেছিস। মনে হচ্ছে এখন থেকে তুইই এই ঘরের কর্ত্রী হয়ে গিয়েছিস?" বৌয়ের প্রতি তিরস্কারসূচক কঠোর কথাবার্তা পাশের ঘর থেকে দেবদত্তজী শুনে তার স্বভাবজাত শান্তভাবে ঠাকুরকে ডেকে বললেন, "আরে বাবা, বৌমা ত ঠিকই বলছে, ওর সোজা কথার ওপর কর্কশভাবে বকাবকি করা ঠিক নয়। তুমি যে হিসাব দাও না এটা মোটেই ঠিক নয়। টাকা-পয়সার হিসাব তো পাই-পয়সা পর্যন্ত হওয়া উচিত। সে যাই হোক,এখন থেকে তুমি ছোট বউকে সব হিসাব দিয়ে দিও । ও লেখাপড়া জানে, সব হিসাব লিখে রাখবে।" তারপর তিনি বৌকে বললেন, "বৌমা, তোমার শ্বাশুড়ী ত ভোলামন, এখন থেকে তুমিই সংসারের হিসাব পত্র রেখো।" সুশীলা ত এই চাইছিল। সে দেওয়া নেওয়ার পুরা হিসাব রাখতে লাগল। ঠাকুর এবং চাকর দুজনেই যা কিছু বাজার করত, সুশীলা তাদের কাছে জিজ্ঞেস করে সব হিসাব লিখে রাখত।

সুশীলার সেবা ও স্বভাব গুণে বাড়ীর সকলেই তার ওপর খুশী ছিল কিন্তু স্বার্থান্বেষী ঠাকুর আর চাকর তাকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির পথের কাঁটা মনে করে ওকে হিংসা করতে লাগল। তারা পদে পদে সুশীলার দোষ খুঁজে বেড়াত আর বাড়ীর অন্যান্য মহিলাদের কাছেও সুশীলার সম্বন্ধে বিষোদ্গার করত। কখনও কখনও তারা সকলকে উস্কানি দিয়ে এমনও বলত যে, "তোমাদের সকলের ওপর তো সুশীলাই কর্ত্রী হয়ে গেছে, দেখো না তোমাদের সামনে ও এ বাড়ীতে এল আর আজ তোমাদের ওপরেই হুকুম চালাচ্ছে।" কিন্তু বাড়ীর লোকেরা এর উত্তরে বলত যে, "ও তো আমাদের সকলের হুকুম মতো চলছে আর ও তো খুবই সুশীলা তোমরা শুধু শুধু এইসব বাজে কথা বলছ।" কিন্তু ওরা দুজন তো সুশীলার পেছনে পড়েছিল তাই সুবিধা পেলেই ওর নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে সকলের কান ভাঙ্গাত।

এ সব সত্ত্বেও সুশীলার কখনও চিত্তচাঞ্চল্য বা মনের মধ্যে অশান্তি[১৪] জাগত না, সে সর্ব্বদাই প্রসন্নচিত্তে থাকত। কিন্তু অন্য মেয়েরা মূর্খ ছিল, তাই বার বার ওইসব বিরুদ্ধ কথা শুনে তাদের মনে এর প্রভাব পড়তে লাগল। ঠাকুর চাকরের কথা সত্যি মনে করে তারা নিজের নিজের স্বামীদের কাছে সুশীলার বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলতে লাগল, কিন্তু সুশীলার স্বভাবগুণে স্বামীরা এতই প্রসন্ন ছিল যে তারা স্ত্রীদের কথায় কান দিত না।

কিছুদিন বাদে সুশীলার একটি কন্যা সন্তান হল, তার নাম রাখা হল ইন্দ্রসেনী। এর দু'বছর বাদে তার একটি পুত্র জন্মায়, পণ্ডিতজী তার নাম রাখলেন ইন্দ্রসেন। পুত্রের জন্মের কয়েকদিন পরে সোমদত্ত এরা সকলে মিলে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে আনন্দ স্ফূর্তি করলেন এবং খাওয়া-দাওয়া, নেশা-ভাঙ, তাস পাশা, হৈ হল্লা খুব হতে লাগল। এইসব দেখে সুশীলা বিণীতভাবে জিজ্ঞেস করলো;এই সবের কারণ কি? বাড়ীর লোকেরা বলল,"এখানকার নিয়মই এই যে, ছেলের মঙ্গলের জন্য উৎসব করা হয়।" সুশীলা বিণীতভাবে বলল,"এতে ত খারাপ সংস্কারের সৃষ্টি হয়, এছাড়া অনর্থক প্রচুর টাকা-পয়সা খরচ হয় আর দিন-রাত এই হৈ হুল্লোড়ের ফলে নিদ্রা বিশ্রাম এসবেরও ব্যাঘাত হয়। আমি ত এর মধ্যে ক্ষতি বই লাভ কিছু দেখছি না। আমার বাপের বাড়ীতে তো খুব সুন্দর নিয়ম রয়েছে। ওখানে নামকরণ সংস্কারের পর বেদ,গীতা পাঠ, কথা কীর্ত্তন এইসব হয়। ধার্মিক, ভক্ত, দানবীর, পরোপকারী আর শৌর্যবীর্য্য-সম্পন্ন বিখ্যাত মানুষদের কাহিনী বক্তৃতা হয়, যার থেকে খুব ভাল ভাল শিক্ষার জিনিষ পাওয়া যায়। তাই আমার আপনাদের কাছে অনুরোধ যে এই ভ্রমাত্মক কার্য্যকিলাপ বন্ধ করুন।" সুশীলার এই অনুরোধ সকলে মেনে নিল এবং ওইসব কার্যকলাপ বন্ধ করে সুশীলার কথা মতই কাজ করল।

বাড়ীতে দ্বিতীয় কোনও নাতি না থাকাতে গৌতমী এই নাতিকে নিয়ে খুব আদর আহ্লাদ করত। সে নাতির হাতে কাল সূতো বেঁধে

দিয়েছিল, গলায় একটা মালার মত করে তাতে বাঘনখ, গালা এবং লোহার আংটি, তাবিজ ও জরখনখ এইসব বাঁধা ছিল। কিছুদিন বাদে ওইসব সুতো হাতে পায়ে চেপে কেটে বসে দাগ ফেলতে লাগল আর ওই মালার গুচ্ছ থেকে বুকে পিঠে সব দাগ পড়তে লাগল। এইসব দেখে সুশীলা শ্বাশুড়ীকে জিজ্ঞেস করল, "মা, বাচ্চার হাতে পায়ে ওইসব সুতো বাঁধা হয়েছে কেন? এতে তো ওর হাত পায়ের ওইসব জায়গাগুলো বাড়াতে পারবে না আর দাগ হয়ে যাচ্ছে, তা ছাড়া রাত্রে ওই মালার সব জিনিষগুলি মুখের ওপর ঘষে যাচ্ছে এবং তাতে ক্ষত চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। এইসব বেঁধে কি লাভ হচ্ছে ?

গৌতমী বলল, "ডাকিনী, পূতনা ইত্যাদির কুনজর থেকে শিশুকে বাঁচানোর জন্য এইসব বেঁধে দেওয়া হয়।" তখন সুশীলা জিজ্ঞেস করল, "আপনি ইন্দ্রসেনীকে তো কখনও এসব পরান নি ?"

গৌতমী বলল, "মেয়েদের রক্ষা তো ভগবান করেন তাই ওদের এসব বাঁধার দরকার পড়ে না। " সুশীলা হাতজোড় করে অত্যন্ত বিণীতভাবে বলল, "মা, ভগবান তো সকলকেই রক্ষা করেন। যে ভগবান ইন্দ্রসেনীকে রক্ষা করছেন তিনিই একেও রক্ষা করবেন। এর জন্য আমাদের এত চিন্তা করার কি প্রয়োজন, এই সবে তো উল্‌টে ভগবানের ওপর অবিশ্বাসই প্রকট হয় আর এতে কোনও লাভই হয় না।"

সুশীলার এই যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য গৌতমী মনে মনে চিন্তা করে বাচ্চার গলার মালা এবং হাত পায়ের সব সুতা খুলে দিল।

(২)

কিছুদিন বাদে হরিদ্বারে কুম্ভমেলা বসল । ছেলেরা সকলে মিলে পণ্ডিতজীর কাছে অনুমতি চাইল যে সকলে মিলে হরিদ্বারে কুম্ভমেলায় যাবে। পণ্ডিতজী খুবই আনন্দের সাথে অনুমতি দিলেন এবং নিজেও যাবেন বললেন। তাড়াতাড়ি সব ব্যবস্থা করে সকলে মিলে যাত্রা করল। যাত্রার সময় সুশীলা সকলের কাছে প্রার্থনা করল

যে "মেলাতে ঠগ্‌, চোর, বাটপাড়, ডাকাত এরাও আসে,তাদের থেকে সাবধান থাকা দরকার। কোনও অপরিচিত নর-নারীর সাথে মেলামেশা করা উচিত হবে না। কারুর দেওয়া কোনও জিনিষ নেওয়া এবং কোনও অপরিচিতকে বিশ্বাস করা ঠিক হবে না। এই যাত্রায় খাওয়া দাওয়াতে সংযম, ধৈর্য্য এবং বিবেকবুদ্ধির দ্বারা সব কাজ করা উচিত হবে। কারুর সামনে নিজের দূর্বলতা এবং ভীরুতা প্রদর্শন ঠিক হবে না বরং ধৈর্য্য, উদ্যম এবং সাহসের সাথে সব সময় কাজকর্ম করা ঠিক হবে ।

পথে অযোধ্যায় স্নান, দর্শন করার উদ্দেশ্যে সেখানে নেমে সকলে এক ধর্মশালায় এসে উঠল। সরযূনদীতে স্নান করে মন্দিরে ভগবান দর্শন করে সকলে আবার ফিরে এল। ধর্মশালার বাইরের চত্ত্বরে রাঁধুনী ব্রাহ্মণ বসেছিল। এক ঠগ্‌ এসে তাকে বলল, "আমি তোমাকে একটা মশলা দিচ্ছি, এই মশলা দিয়ে তুমি ডাল রান্না করলে সেই ডাল খুব সুস্বাদু হবে আর সেই ডাল খেয়ে বাড়ীর লোকেরা তোমার বশ হয়ে যাবে ।" রাঁধুনি ছিল মূর্খ তাই সেই মশলাটা নিয়ে খানিকটা ডালের মধ্যে দিল আর বাকীটা পুরিয়া করে রেখে দিল। রান্নার পরে সোমদত্ত আর রামদত্ত দুই ভাই, ইন্দ্রসেন, ইন্দ্রসেনী এবং বোন রোহিণী খাবার খেয়ে নিল। খাওয়ার সাথে সাথেই ওরা সব অজ্ঞান হয়ে গেল। ব্যাপার দেখে সুশীলা বুঝল যে নিশ্চয়ই খাবারের মধ্যে কিছু হয়েছে নয়ত এরা ক'জনই অজ্ঞান হয়ে গেল কেন ?

তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে গিয়ে দেখে যে একটা কাগজের মোড়কের মধ্যে ধুতুরার বীজ রাখা রয়েছে। সুশীলা পাচক ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি আজ কি রান্না করেছেন যে তা খেয়ে সকলেই অজ্ঞান হয়ে গেল?" ঠাকুর বলল, "কিছুত নয়।" সুশীলা বলল, "কিছু না হলে এরা সব অজ্ঞান হল কেন ? সত্য কথা বলুন নয়ত থানাপুলিশ করা হবে।" এই কথা বলে সুশীলা সেই ধুতুরার বীজ দেখিয়ে বলল, "এগুলো কেন এনেছেন ?" ঠাকুর বলল, "একজন

ভদ্রলোক এসে আমাকে কুড়ি টাকা দান দিয়ে গেল আর এই মশলা দিয়ে বলল, "এই মশলা দিয়ে ডাল রান্না করলে ডাল অতিশয় সুস্বাদু হবে এবং সকলে ডাল খেয়ে খুব খুশী হবে। অমি ত মশলাটা দেখিনি, খানিকটা ডালের মধ্যে দিয়েছি আর বাকীটা মোড়ক করে রেখে দিয়েছি।"

সুশীলা তৎক্ষণাৎ এসে নিজের স্বামীকে সব জানিয়ে ব্যবস্থা করার জন্য বলল। মোহনলাল পণ্ডিতজীকে বলল। সব শুনে পণ্ডিতজী খুবই দুঃখিত এবং আশ্চর্য্য হলেন। তিনি সাথে সাথে ভাল চিকিৎসককে আসতে বললেন এবং পাচক ঠাকুরকে ধমকে বললেন, "তুমি আমাদের সকলকে মেরে ফেলার ব্যবস্থা করেছিলে, তোমাকে পুলিসে দেওয়া উচিত।" পাচক ঠাকুর পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইল। তখন পণ্ডিতজী তাকে ক্ষমা করে বললেন,"ভবিষ্যতে কারও সাথে এরকম করোনা।" ততক্ষণে বৈদ্য এসে গেলেন এবং উপযুক্ত চিকিৎসা হওয়াতে সে যাত্রায় সকলে বেঁচে গেল। সকলেই সুশীলার খুব প্রশংসা করল।

পরের দিন আবার তারা রওনা হল। গাড়ী জ্বালাপুর পৌছাল। বাচ্চাদের পিপাসা পাওয়াতে তাদের নিয়ে সুশীলা নীচে নামল আর গাড়ী ছেড়ে দিল। সকলে শিকল টানল কিন্তু শিকল খারাপ থাকাতে গাড়ী থামল না। পণ্ডিত দেবদত্ত এবং আর সকলে হরিদ্বার পৌছে গেল। শহরে সব জায়গা ভরে যাওয়াতে ওরা গঙ্গার ধারে তাঁবু ফেলে থাকবার ব্যবস্থা করল, কিন্তু বাচ্চাদের সাথে সুশীলা আলাদা হয়ে যাওয়াতে দুশ্চিন্তায় পড়ে ওদের খোঁজ করতে লাগল।

এদিকে সুশীলা কিন্তু একটুও ঘাবড়ায়নি, সে বাচ্চাদের কোলে নিয়ে পায়ে হেঁটে জ্বালাপুর থেকে হরিদ্বার পৌঁছে গেল এবং এক মন্দিরে এসে আশ্রয় নিল। মন্দিরের বিদ্বান পূজারীকে নিজের বর্ত্তমান অবস্থা পুরো সংস্কৃত ভাষায় বুঝিয়ে বলল। ওর বিদ্বতায় পূজারী বেশ প্রভাবিত হলেন এবং তিনি সুশীলাকে ওখানে থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন। এদিকে সুশীলা চেয়ে চিন্তে কিছু কাগজ যোগাড় করে সেই

কাগজগুলিতে নিজের জ্বালাপুর থেকে এসে মন্দিরে থাকার কথা এবং মন্দিরের ঠিকানা লিখে দিল। পূজারী মহাশয়ের সাহায্যে পরোপকারী সেচ্ছাসেবকদের দ্বারা সেই বিজ্ঞাপন শহরের প্রধান প্রধান জায়গায় লাগিয়ে দিয়ে পুলিশেও খবর দিয়ে দেওয়া হল। এর ফলে সেই খবর দ্রুতভাবে সর্বত্র প্রচারিত হল। বাড়ীর লোকেরাতো ওর খোঁজ করছিলই এখন সংবাদ পেয়ে ওকে সেখান থেকে নিয়ে এল। সুশীলার এই অদ্ভুত কর্মকুশলতা এবং ধৈর্য্যের পরিচয় পেয়ে বাড়ীর লোকেরা সব খুব খুশী হল।

মেলায় বহু জনসমাগম হওয়াতে এরা খাঁটি দুধ পাচ্ছিল না। অথচ ওদের ওখানে কিছুদিন থাকবার পরিকল্পনা ছিল, তাই ওরা দুশো টাকা দিয়ে একটি গরু কিনে সুখে ওখানে থাকতে লাগল। নিজেরা পালা করে নিজেদের পাহারা দিতে লাগল। একদিনের কথা সেদিন সুশীলার পাহারা দেবার পালা। রাত তখন চারটে বাজে। একটা চোর এসে গরুটাকে খুলে নিয়ে যাচ্ছিল। সুশীলা এমনিতে খুবই দূরদর্শী ছিল। প্রথম থেকেই সে একটা ঘন্টা যোগাড় করে সকলকে বলে দিয়েছিল যে কখনও চোর বাটপাড় এলে বা কোনও বিপদ হলে জোরে ঘন্টা বাজিয়ে দেওয়া হবে । জোরে চীৎকার করতে লজ্জা হয় অথচ না জানাতে পারলে বিপদের আসান হয় না—চোরেরা চুরি করে নিয়ে যায় । এইসব ভেবে সুশীলা প্রথম থেকেই এই ব্যবস্থা করে রেখেছিল । চোরকে দেখামাত্র সুশীলা খুব জোরে ঘন্টা বাজিয়ে দিল। ঘন্টার আওয়াজে সকলেরই ঘুম ভেঙ্গে গেল এবং সকলে একসাথে "কি হল" "কি হল" বলে চীৎকার করে উঠল। চীৎকারের শব্দে চোর পালিয়ে গেল। বৌয়ের এই বুদ্ধির পরিচয়ে সকলেই খুব প্রসন্ন হল।

কুম্ভ স্নানের পর্বে সকলেই হর-কি-প্যারীতে স্নান করতে চলল। অত্যধিক ভীড়ের ফলে বেশ কিছু যাত্রী রাস্তায় পিষ্ট হয়ে মারা যায়। কিন্তু বুদ্ধিমতী সুশীলা সুন্দর কৌশলে বাড়ীর লোকেদের ভীড় থেকে বাঁচিয়ে রাস্তার ধার দিয়ে হেঁটে ঘাটে নিয়ে গেল। গঙ্গা স্নান করে

সকলে তাঁবুতে ফিরে এল। এর দু'চারদিন পর সকলে প্রয়াগে ফিরে এসে আবার নিজেদের বাড়ীতে আগের মত বাস করতে লাগল।

(৩)

একবার গ্রীষ্মকালে পূর্ণিমার সন্ধ্যায় সুশীলা বাড়ীর ছাদে বেড়াচ্ছিল । পাশের বাড়ীর গিন্নীও তাদের ছাদে এসেছিল। ওই মহিলা অবস্থাপন্ন ঘরের বিধবা ব্রাহ্মণী ছিলেন। তার দুই ছেলে, একজনের ষোল বছর আর একজনের তিন বছর বয়স। দুই বাড়ীর ছাদ একেবারে লাগালাগি হওয়াতে সুশীলা গিয়ে তাকে অভিবাদন করল। ওই মহিলা খুবই রুক্ষ্ম স্বভাবের ছিল। সুশীলার অভিবাদনের উত্তরে সে বলল, "কি রে, তুই দু'অক্ষর লেখাপড়া শিখে অহঙ্কার করে আমাকে উপহাস করছিস।" সুশীলা বলল, "না মা, আমি ত আপনাকে নিজের মায়ের মত মনে করে আপনাকে নমস্কার জানালাম।" সে বলল, "আচ্ছা, তুই ত বেশ চালাকি করে আমাকে তোর বাপ আর শ্বশুরের বউ বানাতে চাইছিস। তোর ওই পোড়াকপালে বাপ আর শ্বশুরের দাড়ি আমি জ্বালিয়ে দেব,যারা আমাকে তাদের বউ বানাতে চায়।" এইরকম গালাগালি করে সেই মহিলা নীচে নেমে রাস্তায় গিয়ে চেঁচামেচি শুরু করল। রাস্তার লোকেরা এবং এদিক ওদিক থেকে পাড়াপড়শীরা ওর চিৎকারে চারদিকে জড় হয়ে গেল, তখন সেই মহিলা তাদের বলতে লাগল, "এই ছুঁড়ি সুশীলার স্পর্ধা দেখে বাঁচি না, ও আমাকে ওর বাপ ঠাকুরদার বউ বানাতে চায় !

এইসব শুনে সুশীলার হিতৈষীরা তাকে বলল যে, "তুমি তোমার স্বামীকে বলে ওকে পুলিশে দেবার ব্যবস্থা কর। আদালত থেকে ওর উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়ে যাবে। কেউ কাউকে অকারণে গালিগালাজ করতে পারে না।" উত্তরে সুশীলা অতি বিণীতভাবে করজোড়ে ভালোবাসার সুরে তাদের বোঝাল - "ভাল লোকেরা পুলিশের কাছে যায় না। দেখুন, ভগবানের ইচ্ছা হলে খুব শীগ্গিরই ভালবাসা দিয়ে

ওকে আমি আপন করে নেব।" সুশীলার এই সরল অদ্রোহভাব[২৫], হিতৈষতাপূর্ণ নির্বৈর ব্যবহার দেখে তারা সকলে মুগ্ধ হয়ে গেল।

এইরকমই আর একদিন ওই মহিলার তিন বছরের শিশুপুত্রটি বাড়ীব বাইরে রাস্তায় খেলা করছিল,এমন সময় দুটো ষাড় লড়াই করতে করতে সেই শিশুটির সামনে এসে গেল। ব্যাপারটা সুশীলার চোখে পড়তেই দৌড়ে ওখানে গিয়ে ছোঁ মেরে ছেলেটিকে কোলে তুলে নিল, আর তার মায়ের কাছে পৌঁছে দিয়ে বলল যে, "বাচ্চাদের একলা রাস্তায় ছাড়তে নেই। দুটো ষাড় লড়াই করতে করতে ওখানে এসেছিল কিন্তু কোনও অনিষ্ট করার আগেই আমি ওকে তুলে নিয়ে এসেছি।" উত্তরে মহিলাটি বলল, "যা,যা, তোর কি দরকার ছিল ওকে তুলে আনবার। আমি নিজেই তো নিয়ে আসতে পারতাম।" সুশীলা বলল, "আমি নিয়ে এসেছি তাতে আমার কোন্ ক্ষতি হয়েছে ?" এই বলে বাচ্চাটিকে তার মায়ের কাছে বসিয়ে দিয়ে বাড়ী চলে এল।

সুশীলার বাপের বাড়ীতে এক ধনী ব্রাহ্মণ ছিল, সে সুশীলাকে খুব শ্রদ্ধা করত। তার বার বছরের মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব সুশীলার পাশের বাড়ীর সেই মহিলার বড় ছেলের সাথে চলছিল এবং সেই উপলক্ষে সেই ব্রাহ্মণ সুশীলার কাছে লোক পাঠায় । শহরের এক ভদ্রলোক এই সংবাদ সেই বিধবা মহিলাকে জানিয়ে বললেন যে, "আপনার ছেলের বিয়ের সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে সুশীলার বাপের বাড়ী থেকে জনৈক ভদ্রলোক সুশীলার কাছে এসেছেন ।" শুনে সেই মহিলা বলল, "সুশীলা ত আমার সাথে ঝগড়া করছে আর সর্বদাই আমার সাথে শত্রুতা করছে ।" এই কথা বলে সে সুশীলার বাড়ীর দরজায় আড়ি পেতে সুশীলার বাপের বাড়ীর লোকের সাথে তার কথাবার্তা শুনতে লাগল।

ব্রাহ্মণ সুশীলাকে বলল, "তোমার ভাইয়ের বন্ধু তোমার ওপর বিশ্বাস করে আমাকে এখানে পাঠিয়েছে। তোমার পাশের বাড়ীর বিধবা

ব্রাহ্মণ ভদ্রমহিলার ষোল বছরের একটি ছেলে আছে তার সাথে তোমার ভাইয়ের বন্ধুর মেয়ের বিয়ে দিতে চান এবং এই বিষয়ে তোমার মতামত জানতে চান ।" সুশীলা সবই জানত যে দুই পরিবারই ধনী, দুই বাড়ীর মহিলাই কোপন স্বভাব এবং কলহপ্রিয় । তাই সে বলল, "তার পক্ষে এই সম্বন্ধ ভালই হবে ।" ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক বললেন, "ছেলের মাকে তো লোকেরা কোপন স্বভাবের বলে ।" তাতে সুশীলা উত্তর দেয় – "আজকাল মেয়েদের বুদ্ধি কম হওয়াতে সব সংসারেই রাগ-দ্বেষ আর ঝগড়া ঝাটি লেগেই থাকে । আর এর ফলে একের অপরকে নিন্দা করার স্বভাব হয়ে গেছে । আমার মতে তো এই সম্বন্ধ করে নেওয়াই ভাল ।" এই সংবাদ নিয়ে সেই ভদ্রলোক নিজের গ্রামে চলে গেলেন ।

সেই দজ্জালনী মহিলা দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনলেন এর ফলে তার মনের ওপর সুশীলার এই ব্যবহারে খুবই প্রভাব (২১) পড়ল । সে সোজা ঘরের মধ্যে গিয়ে সুশীলাকে বলল, "সুশীলা, ধন্য মেয়ে তুমি, আমি তোমার সঙ্গে এতদিন চরম খারাপ ব্যবহার করেছি অথচ তুমি ক্রমাগত আমার মঙ্গলই করে চলেছ । বোন, আমি তোমার এই ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে গেছি। এই বিদ্যা তুমি কোথায় শিখেছ ? আমার স্বভাব কি কোনও রকমে শুধরে গিয়ে তোমার মত হতে পারে ? আমি তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাই, আমি কি মাঝে মাঝে তোমার কাছে এসে গল্পগুজব করব ?" সুশীলা বলল, "কেন নয় ? এতো আপনারই বাড়ী । আপনি মাঝে - মাঝে যদি আসেন সেতো আমার মহা সৌভাগ্য। আমার ওপর আপনার কত দয়া আর ভালবাসা !" সুশীলার এই উত্তরে সেই মহিলা খুবই খুশী হল আর প্রায়ই সুশীলার কাছে যাতায়াত করতে লাগল । এর ফলে ওর মনটাও ধীরে ধীরে শোধরাতে লাগল এবং কালক্রমে সেও সুশীলার মতই সুন্দর স্বভাব প্রাপ্ত হল ।

পড়া পড়শীরা ওই মহিলার এই অদ্ভুত পরিবর্তন দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেল এবং যেই পড়শী একসময় সুশীলাকে থানায় যাবার উপদেশ

দিয়েছিল সে এসে সুশীলাকে বলল, "সুশীলা এতো বড়ই অশ্চর্য্যের ব্যাপার যে তুমি ওকে বদলে তোমারই মতন করে নিয়েছ ।" সুশীলা বলল, "সবই ভগবানের কৃপা, সেই হিতৈশী তখন বলল,"তুমি ধন্য সুশীলা । আমরা যে এই মহিলাকে পুলিশে দেবার পরামর্শ দিয়েছিলাম সেটা আমাদের ভুল হয়েছিল ।

কিছুদিন পরে ওই মহিলার ছেলের বিয়ে স্থির হয়ে গেল এবং সাদরে নিমন্ত্রণ করে সুশীলার বাড়ীর সকলকে সে বিয়েতে নিয়ে গেল। বাড়ীর সকলেই বরযাত্রী হয়ে তিন দিনের জন্য বাইরে চলে গেল । ইতিমধ্যে সেই পাড়ায় এক ব্যবসায়ীর বাড়ীতে চুরি হয়ে গেল। সেই ব্যবসায়ীকে সঙ্গে করে পুলিশ পণ্ডিতজীর বাড়ী তল্লাসী করতে এল। বাড়ীর মেয়েরা খুব ঘাবড়ে গেল । গৌতমী সুশীলাকে বলল, "বৌ, বাড়ীতে পুলিশ ঢুকেছে এটা ভাল নয় । কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে এদের বিদায় করে দাও ।" সুশীলা বলল, "আপনি চিন্তা করবেন না, আমি সব সামলে নেব ।" এই কথা বলে সুশীলা সেই ব্যবসায়ীকে গিয়ে বলল, "আমাদের বাড়ীতে এখন কর্ত্তারা কেউ নেই, এ অবস্থায় পুলিশ দিয়ে তল্লাসী করিয়ে আপনি কি আমাদের বেইজ্জত করতে চান ? আপনি কি মনে করেন যে আপনার চুরির জিনিষ আমাদের বাড়ীতে রয়েছে ?" ব্যবসায়ী বলল, "না মা, আমি ত এটা চাইনি। আমাকে ত পুলিশের লোকেরা এখানে নিয়ে এসেছে ।" তখন সুশীলা নির্ভীকভাবে পুলিশকে বলল, "আপনি কি আমাদের বাড়ী তল্লাসী করতে এসেছেন ?" পুলিশ বলল, "গতকাল রাত্রে এই ব্যবসায়ীর বাড়ীতে চুরি হয়েছে তাই আমরা তল্লাসীর জন্য এসেছি । সুশীলা নির্ভয়ে [১] বলল, "ঠিক আছে, আপনি আমাকে লিখে দিন যে আমি নিজের ইচ্ছায় এই বাড়ী তল্লাসী করছি আর আমার প্রশ্নের উত্তর দিন যে তল্লাসী করে যদি কিছু না পাওয়া যায় তবে এই অসম্মা'নের জন্য কে দায়ী হবে আমি কার কাছে এর প্রতিবিধান চাইব ?" এইসব শুনে কোতয়াল ঘাবড়িয়ে গিয়ে বলল যে 'এই ব্যবসায়ী লোকটি আমাকে এ বাড়ীতে নিয়ে এসেছে, এখন অস্বীকার করছে', এই কথা

বলে তারা ওখান থেকে চলে গেল । বরযাত্রী ফেরৎ বাড়ীর লোকেরা ঘটনা শুনে খুবই খুশী হল এবং সুশীলাকে আরও বেশী শ্রদ্ধা ভালবাসা করতে লাগল ।

(৪)

এইভাবে বাড়ীর কর্ত্তারা সুশীলাকে খুব শ্রদ্ধা সম্মান করতে লাগল । আর তার ফলে বাড়ীর অন্য মেয়েদের মনে ঈর্ষ্যার উৎপত্তি হল । সুশীলার সম্বন্ধে তাদের মনে হীণমন্যতা জন্মাল আর ওকে নীচু করবার জন্য ওর ছিদ্রান্বেষণ করতে লাগল, কিন্তু সুশীলার মধ্যে তো কোনও দোষই ছিল না, সে তো সকলের সেবা আর গুণগান নিয়েই থাকত আর কখনও কারুর দোষই দেখত না । তার ফলে তাদের ছিদ্রান্বেষণ চেষ্টা সফল হত না। বাড়ীর ঠাকুর চাকরেরা এই পরিস্থিতির সুযোগ নেবার চেষ্টা করল ।

একদিন বাড়ীর মেয়েরা ঠাকুর চাকরের সঙ্গে একত্র হয়ে সুশীলাকে অপদস্থ করার এক ষড়যন্ত্র করল । সেই ব্যবস্থা মত রামদেবী এক মিথ্যা প্রচার করল যে তার সোনার বালা চুরি হয়েছে এবং তার সন্দেহ যে চুরি সুশীলাই করেছে । বাড়ীর কর্ত্তারা ব্যাপারটা বিশ্বাস করল না । এর কিছুদিন পরে বোন রোহিনী এক মিথ্যা প্রচার করল যে তার সায়া এবং একটা শাড়ী আগের দিন থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। এতে বাড়ীর ছেলেরা আশ্চর্য্য হয়ে ভাবতে লাগল যে বাড়ীর থেকে এত ঘন ঘন চুরি কি করে হচ্ছে ! খোঁজ খবর করা হল কিন্তু কিছুই বোঝা গেল না । এর কয়েকদিন পরে ভগবানদেবী জানাল যে তার সোনার হার গতকাল রাত থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। বাড়ীর লোকেরা অনেক খোঁজাখুজি করল কিন্তু কোনও হদিশ পাওয়া গেল না, পাওয়া যাবে কি করে, যার জিনিষ সেই যদি লুকিয়ে রাখে! বাড়ীর সব মেয়েরা সুশীলাকেই দায়ী করল ।

ওই পাড়ায় ভক্তিদেবী নামে এক বৃদ্ধা মহিলা ছিলেন তার বাপের বাড়ী সুশীলার বাবার বাড়ীর কাছাকাছি এবং সুশীলার মার সঙ্গে তার খুব বন্ধুত্ব ছিল ।

চাকর বাকরদের কাছে শোনা গেল যে ভক্তিদেবী আগামীকাল বাপের বাড়ী যাবে । এই খবর শুনে ঠাকুর চাকর আর বাড়ীর মেয়েরা এক ষড়যন্ত্র করল । যে চারটে জিনিষ হারিয়ে গেছে বলে রটনা করা হয়েছিল সেগুলো একটা থলের মধ্যে সেলাই করে রোহিনী সেই থলেটা ঠাকুরকে দিয়ে ভক্তিদেবীর কাছে পাঠিয়ে দিল । থলের মধ্যে একটা চিঠিও দিল যাতে লেখা ছিল– "মা তুমি সুশীলার প্রণাম নিও। ভক্তিদেবীর সাথে এই থলেটা পাঠালাম এ খবর কেউ যেন জানতে না পারে।" ঠাকুর ভক্তিদেবীর কাছে গিয়ে বলল, "সুশীলা ওর মায়ের জন্য এই থলেটা পাঠিয়েছে আর বলেছে যে এটা যেন ওর মাকেই দেওয়া হয় অন্য কারও হাতে যেন না দেওয়া হয় এবং এই বলে সে ফিরে এল ।

সেইদিন রাত্রে রোহিনী সুশীলাকে বাদ দিয়ে বাড়ীর সব মেয়ে এবং কর্ত্তাদের একত্র করে বলল যে ক্রমাগত এই বাড়ীর থেকে যে সব জিনিষ চুরি যাচ্ছে সেজন্য আমরা সুশীলাকেই সন্দেহ করি । আমাদের পাড়ার বৃদ্ধা ভক্তিদেবীর সঙ্গে সুশীলার মায়ের খুব বন্ধুত্ব । আগামীকাল ভক্তিদেবী তার বাপের বাড়ী যাবে । তার সাথে সুশীলা বোধ হয় কিছু জিনিষ তার মায়ের কাছে পাঠাচ্ছে। কাল ভোরবেলাই ভক্তিদেবী বাপের বাড়ী যাচ্ছেন আর আমাদের বাড়ীর সামনে দিয়েই যাচ্ছেন । তখন তাকে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞেস করা উচিত এবং সুশীলা তাঁর মায়ের কাছে কি জিনিস পাঠাচ্ছে তাও দেখা উচিত।

পরদিন সকালে সুশীলার স্বামী মোহনলাল বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে ভক্তিদেবীব জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগল । ভক্তিদেবী এলে পর তাকে জিজ্ঞেস করল, "বুড়ী মা কি নিয়ে যাচ্ছ ?" ভক্তিদেবী বলল, "সুশীলা ওর মায়ের জন্য একটা চিঠি আর একটা থলে দিয়েছে ।"

মোহনলাল বলল, "ওটা নেবার দরকার নেই, ওটা ফেরত দিয়ে যাও" এই বলে ওই চিঠি আর থলেটা নিয়ে ভক্তিদেবীকে যেতে বলে দিল।

বাড়ীতে সকলে যেখানে বসেছিল মোহনলাল সেখানে গিয়ে ওই চিঠি এবং থলে রেখে ভক্তিদেবীর সঙ্গে যে কথোপকথন হয়েছিল তা পেশ করল । সকলে মিলে থলেটা খুলে তার মধ্যে হারানো সেই চারটি জিনিষ পেয়ে গেল । তারপর চিঠি খুলে যখন পড়ল তখন সব পরিস্কার হয়ে গেল । অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে মোহনলাল নিজের ঘরে গিয়ে সুশীলাকে অকথ্য ভাষায় গালি গালাজ করতে লাগল – "শয়তান বেরিয়ে যা এ বাড়ী থেকে । তুইই ঘরের সব জিনিষ চুরি করে নিজের মায়ের কাছে পাঠাচ্ছিলি, ভক্তিদেবীর কাছ থেকে সব জিনিষ আর চিঠি পাওয়া গেছে । তোর মত চোরকে কোনও মতেই এ বাড়ীতে রাখতে চাই না । যেখানে ইচ্ছা তুই চলে যা ।" সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং অপ্রত্যাশিত অভিযোগ শুনে সুশীলা চমকিত হয়ে গেল,তার চোখ দিয়ে অশ্রুধারা বইতে লাগল । অত্যন্ত করুণভাবে বলল, "স্বামী তুমি বিশ্বাস কর, এসব কাজ আমি করিনি। ভগবানের দিব্যি । তুমি শান্ত হয়ে সব জিনিষটা চিন্তা কর । ওই বৃদ্ধাকে একটু জিজ্ঞেস করুন ত যে ওই থলে আর চিঠি কে দিয়ে এসেছিল । না আমি কোনও চিঠি লিখেছি, না আমি কোনও থলে ভক্তিদেবীকে দিয়েছি। তুমি এই চিঠির হস্তাক্ষর ত দেখ যে সেগুলো কার লেখা । তোমার এই ব্যাপারে বিশদ্‌ভাবে অনুসন্ধান করা উচিত।" কিন্তু বউ-এর এই কাজে মোহনলাল তখন ক্রোধে অন্ধ । ক্রোধে বিবেক নষ্ট হয় । অনুসন্ধানের আছেটা কি, জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ সামনে রয়েছে! চীৎকার করে বলে উঠল, "সাফাই গাইতে তোর লজ্জা করে না ? তুই ত আমার মুখে চূন কালি লাগিয়েছিস । এ কলঙ্ক ঘুচবার নয় । আমি তোর মুখদর্শন করতে চাই না, এই মুহূর্তে এখান থেকে দূর হয়ে যা ।" সুশীলা মিনতি করে অনেক কিছু বলল কিন্তু মোহনলাল কিছুই শুনল না আর সুশীলাকে বাড়ীর থেকে বের করে দিল। ইন্দ্রসেনের বয়স তখন চার আর ইন্দ্রসেনীর ছয় । ঠাকুরমা ওদের

তার নিজের কাছে রেখে দিল। ষড়যন্ত্রের সাফল্যে ঠাকুর, চাকর এবং বাড়ীর মেয়েরা আনন্দে ডগমগ করতে লাগল আর বলে বেড়ালো যে এতো জানাই ছিল যে,এত বড় বড় কথা যে বলে সে ভেতরে ভেতরে নিশ্চয়ই অতি নীচ । কিন্তু সকলের ওপরই একটা যাদু করে রেখেছিল আজ সব মুখোস খুলে পড়ল ।

এইরকম অনুচিত ব্যবহার দেখেও সুশীলার মনে কোনও ক্রোধ[১২] বা প্রতিহিংসারভাব[১০] উৎপন্ন হল না । সে কাউকে দোষ না দিয়ে নিজের প্রারব্ধকে এর জন্য দায়ী করতে লাগল । সে মনে মনে ভাবল, "নিরপরাধ আমার ওপর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে আমার স্বামী যখন আমাকে ত্যাগ করেছে তখন আমার জীবন ধারণে আর কি প্রয়োজন ? কিন্তু শাস্ত্রে আছে যে নারীর জন্য পতিই তীর্থ, পতিই ব্রত, পতিই সবকিছু । সুতরাং পতির নির্দিষ্ট বিধানই আমার মেনে নেওয়া উচিত আর সর্বদা ধৈর্য্য রাখা উচিত। সব মানুষের জীবনেই ত বিপদ আসে। বিবেকবান মানুষ কোনও অবস্থাতেই নিজের স্থৈর্য্য এবং ধর্ম থেকে বিচলিত হয় না । গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, –

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ ।

বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ।। (২/৫৬)

দুঃখপ্রাপ্তিতে যার মনে কোনও উদ্বেগ না হয়, সুখের প্রাপ্তিতে যে সর্বতোভাবে নিঃস্পৃহ এবং যার রাগ, ভয় ও ক্রোধ নষ্ট হয়ে গেছে- এইরকম মুনিকে স্থিরবুদ্ধি বলা হয় ।

শ্রীতুলসীদাস বলেছেন –

ধীরজ ধর্ম মিত্র অরু নারী । আপদকাল পরিখিঅহিঁ চারী ।।

সুতরাং দুঃখের আবেগে জীবননাশ করা কোনও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এতে ইহলোক বা পরলোক কোথাও সুখ পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে বাড়ী ছাড়ার দরুণ যে দুঃখ আমি এখন ভোগ করছি

আত্মহত্যা করে জীবন ছাড়ার সময় ত এর থেকেও বেশী দুঃখ হবে। মানুষ যখন মৃত্যুর উদ্দেশ্যে নদীতে ঝাঁপ দেয় তখন তার এত কষ্ট হয় যে বাঁচবার জন্য জলের মধ্যে আকুলি বিকুলি করতে থাকে। এইরকমই মৃত্যুর জন্য যে বিষ পান করে সে বিষ পানের পর বাঁচবার জন্য, সেই বিষকে উদ্‌গার দিয়ে ফেলবার জন্য কি চেষ্টাই না করে। যে মানুষ কেরোসিন শরীরে ঢেলে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করে সে ত জ্বলবার সময়ও "বাঁচাও, বাঁচাও" চীৎকার করে ছট্‌ফট্ করতে করতেই মরে । সে যে কেবল ইহলোকেই কষ্ট পেল তা নয় , মৃত্যুর পর অন্ধকারময় নরকে গিয়ে ঘোর কষ্ট এবং দুর্গতিও ভোগ করে ।

অসুর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাঽঽবৃতাঃ ।

নাঁস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ।।

(ঈশাবাষ্য ৩)

অজ্ঞান আর দুঃখক্লেশরূপ ভয়ানক অন্ধাকারে আবৃত নানাপ্রকার আসুরী যোনি আর নরকরূপ লোক, আত্মহত্যাকারী মানুষ মৃত্যুর পর সেইসব লোকেই বারংবার গমনাগমন করে ।

শুধু এই নয়, আত্মহত্যাকারীর পিতৃকূল এবং শ্বশুরকূল উভয়ই চিরকালের জন্য কলঙ্কিত হয়ে থাকে । এ সব ত আমার পক্ষে নিতান্ত লজ্জার(১৯) ব্যাপার । উত্তম নারীর পক্ষে আত্মহত্যার চিন্তাও কলঙ্কজনক। সুতরাং কোনও মতেই আমি আমার প্রাণনাশ করব না। ঈশ্বরের দরবারে ন্যায়ের রাজত্ব আর আমি নিজে জানি যে আমি সাচ্চা । আমি জীবিত থাকলে এমন একদিন আসবে যেদিন এই সব কলঙ্ক ধুয়ে মুছে পরিস্কার হয়ে যাবে । মিথ্যা অপবাদ কতদিন থাকবে? আমার কথা আর কি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ওপরেও মণি চুরির মিথ্যা কলঙ্ক রটেছিল কিন্তু টিকল না । এইসব বিচার বিবেচনা করে সুশীলা নিজের হৃদয়ে ধৈর্য্য(২০) ধারণ করল আর স্বতঃপ্রাপ্ত কষ্টকে সহ্য করে

স্বধর্মপালনরূপ তপস্যা[৮]তে প্রবৃত্ত হল এবং নিজের জীবনযাত্রা নির্বাহের সৎপথের চিন্তা করতে লাগল।

(৫)

সন্ধ্যার সময় সুশীলা এক ধর্মশালায় গিয়ে ঘর নিল । সেখানে নিত্য নিরন্তর নিয়মিতরূপে পরমাত্মার ধ্যান[৩] করত যার ফলে ওর অন্তঃকরণ পবিত্র[২] হতে লাগল । মন এবং ইন্দ্রিয়সংযম[৫] পালন করে দৈনিক গীতা, রামায়ণের স্বাধ্যায়[৭] এবং ভগবানের পবিত্র নাম জপ করতে লাগল এবং মনে কোনও রকম দ্বেষ না রেখে নিজের স্বামীর মন এবং বিচার বিবেচনা শুদ্ধ হওয়ার জন্য কাতর প্রার্থনা করত ।

ওর সঙ্গে বাড়ীর টাকা-পয়সা হিসাব-নিকাশের পর পাঁচটা টাকা ছিল। সেই পাঁচ টাকা দিয়েই ভবিষ্যৎ জীবনের কর্মসূচী স্থির করে নিল । পরের দিন বাজারে গিয়ে চার আনার সূঁচ, পৌনে দু টাকার রঙ্গীন সূতো, আট আনা দিয়ে নিজের জন্য ডাল-আটা-মশলা, চার পয়সায় থালা প্রভৃতি, দু'টাকা সাত আনা দিয়ে একটা বালতী আর মালসা কিনে আনল । মালসার মধ্যে আটা মেখে থালা ওপর রেখে দিল তারপর মালসাটি উল্টে নিয়ে আগুনে রেখে তার উপরে রুটি সেঁকে নিল । তারপর গামলাটা ধুয়ে তার মধ্যে ডাল রান্না করল। এইভাবে নিজের খাবার রান্না করে নিল । ভোজনের পর দিনের বেলা সূতোর গেঞ্জী এবং মোজা বুনে ফেলল আর সেগুলো বাজারে বিক্রী করে সাড়ে তিন টাকা রোজগার করল । রোজ এইভাবে পৌনে দু'টাকা রোজগার করতে লাগল তার থেকে বার আনা দিয়ে দুবেলার আহার্য্য কিনে এক টাকা জমাতে লাগল । পনের দিনে পনের টাকা জমার পর পাঁচ টাকা মাসিক ভাড়ায় একটা ঘর নিল, পাঁচ টাকা দিয়ে রান্নার বাসনকোসন আর পাঁচ টাকাব সূতো কিনল ।

এরপর সুশীলা শহরে বিজ্ঞাপন দিল যে সাড়ী, ঘাগড়া, ওড়না, চাদর, দোপাট্টা ইত্যাদি সূচীকর্ম, দোহা, চৌপাই, শ্লোক ইত্যাদি

লেখান দরকার থাকলে ওর ঘরে দিয়ে যেতে। বিজ্ঞাপন দেখে লোকেরা এইসব কাজ ওর ঘরে দিয়ে যেতে লাগল । ওর সুন্দর হস্তাক্ষরে ভাল ভাল দোহা চৌপাই শ্লোক দেখে এবং সুন্দর সূচীশিল্পের কাজ দেখে লোকেরা ওর শিক্ষা এবং নিপুণতায় মুগ্ধ হয়ে গেল। এর থেকে ক্রমে মাসিক দেড়শো দুশো টাকা রোজগার হতে লাগল । এক বছর বাদে একটা বড় বাড়ী ভাড়া নিয়ে মেয়েদের পাঠশালা স্থাপন করল এবং সেখানে বিনা বেতনে ব্যাকরণ, গীতা, রামায়ণ ইত্যাদি হিন্দী ও সংস্কৃত গ্রন্থ পড়াতে লাগল। লেখাপাড়া শেখানোর সাথে সাথে মেয়েদের হাতের কাজেরও শিক্ষা দিতে লাগল । মেয়েরা ওখানে যা কিছু জিনিষ তৈরী করত সে সব বাজারে বিক্রী করে মাসে প্রায় দুশো টাকার মত লাভ হতে লাগল । এইভাবে এক বছরে সব খরচা বাদ দিয়ে দু'হাজার টাকা জমে গেল ।

এর পর সুশীলা এক টুকরো জমি কিনে সেখানে একটা কাঁচা বাড়ী তৈরী করল আর একটা গরু কিনে একটি চাকর নিযুক্ত করল, যে গরু এবং বাড়ীর সব কাজ কর্ম করত। এইভাবে পরের বছর ওর পাঁচ হাজার টাকা জমল ।

তৃতীয় বছরে নিজে সিল্কের কাপড়, সূতো, ইত্যাদি কিনে তার উপর গীতা রামায়ণের শ্লোক, দোহা, চৌপাই এবং সুন্দর সুন্দর এমব্রয়ড়াবীর কাজ করে সত্য এবং ন্যায়ের পথে[১১] কেনা বেচা করতে লাগল আর অন্য যারা নিজের কাপড়ে এসব কাজ করাতে আসত তাদের কাজও করতে লাগল। তার সত্য, ন্যায়, বিনয় আর প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারে জন-সাধারণের সকলেই খুব সন্তুষ্ট থাকত। এইভাবে ব্যবসা করতে করতে সুশীলার পনের হাজার টাকা জমে গেল এবং তার সমস্ত রকম খরচা বাদ দিয়ে প্রতি মাসে প্রায় হাজার টাকার মত জমত। এইভাবে আর্থিক সচ্ছলতায় শহরে ওর বেশ সুনাম হয়ে গেল । সে একজন ধনী ব্যক্তির মত সম্মানিত গণ্য হল । আস্তে আস্তে সেই জমির ওপর পাকা বাড়ী তৈরী করল আর বেশ কয়েকজন কর্মচারী রেখে ব্যবসা বেশ ফলাও ভাবে চলতে লাগল । সুশীলার

চরিত্র এবং স্বভাব এমনিতেই পবিত্র, সাত্ত্বিক আর আদরণীয় ছিল এখন তার কাজ এবং ব্যবহারে তার খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। ওর হৃদয় দীন, দুঃখী, অনাথ, গরীব, আতুরদের দয়াতে[(১৬)] ভরা ছিল সেইজন্য সে প্রয়োজন অনুসারে নিস্কামভাবে অন্ন, বস্ত্র দান[৪] করতে লাগল, প্রত্যেক দিন খাদ্য পাক করে ভগবানের চরণে উৎসর্গ করে বিনামন্ত্রে বলিবৈশ্বদেব[৬] পালন করত আর আগে অতিথিকে ভোজন করিয়ে তারপর নিজে খাদ্য গ্রহণ করত ।

(৬)

এদিকে সাধ্বী সুশীলাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়াতে বাড়ীর সবার বাইরে খুব নিন্দা হতে লাগল আর বাড়ীর মধ্যে নিজেদের অবনিবনা এবং বুদ্ধিবিবেচনা ও দূরদর্শিতার অভাবে ধীরে ধীরে ধন-সম্পদ সব নষ্ট হতে লাগল।

একদিন রোহিনীর কাছে ওই পাড়ার এক মহিলা এসে বলল যে তার পঞ্চাশটা টাকার দরকার । যদি রোহিনী টাকাটা দেয় তাহলে সে শতকরা দুটাকা সুদ দেবে । তাকে সম্পন্ন ঘরের মহিলা মনে করে রোহিনী তাকে টাকাটা দিয়ে দেয় । খানিকবাদে মহিলা ফিরে এসে একটা টাকা ফেরত দিয়ে বলে যে পঞ্চাশের বদলে তাকে একান্ন টাকা দেওয়া হয়েছিল এইজন্য সে একটাকা ফেরত দিয়ে গেল । এতে রোহিনী খুব মুগ্ধ হয়ে গেল । সে টাকাটা নিয়ে ভাবল যে মহিলা সত্যি সত্যিই বড় ঘরের ঘরনী । এর দিন পনের পরে সেই মহিলা এসে পঞ্চাশটা টাকার সাথে এক মাসের সুদ সমেত একান্ন টাকা দিয়ে গেল । রোহিনী তাকে বলল, "আপনি ত আরও কিছুদিন টাকাটা রাখতে পারতেন ।" উত্তরে সেই মহিলা বলল, "যখন প্রয়োজন হবে তখন নেব, এখন আমার আর দরকার নেই।"

কিছুদিন বাদে সেই মহিলা আবার এসে দুশো টাকা ধার চাইল। রোহিনীর তার ওপর বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল । চাইবামাত্র দুশো টাকা দিয়ে দিল । দশদিন পরে সেই মহিলা দুশো টাকা এবং এক মাসের

সুদ সমেত দুশ চার টাকা ফেরত দিয়ে গেল । এতে রোহিনীর তার ওপরে বিশ্বাস আরও বেড়ে গেল ।

এর কিছুদিন পরে সেই মহিলা আবার এসে খুব কান্নাকাটি করতে লাগল । রোহিনীর প্রশ্নের উত্তরে সে জানাল যে তার কুটুমের বাড়ীতে বিয়ের নিমন্ত্রণ অথচ তার সমস্ত গয়না বাড়ীর লোকেরা বন্ধক রেখে দিয়েছে । এদিকে গয়না ছাড়া বিয়ে বাড়ীতে যাওয়া যায় না, আপনি যদি দয়া করে তিন দিন বিয়েতে পরার মত আপনার গয়না-গাটি আমাকে দেন তবে আমার সম্মান রক্ষা হয় ।" রোহিনীর ত তার ওপরে বিশ্বাস আগের থেকেই ছিল, সে তার নিজের সব গয়না বের করে সেই মহিলাকে দিয়ে দিল । এদিকে তিন দিনের জায়গায় পাঁচ-দিন হয়ে গেল অথচ সেই মহিলা না আসাতে রোহিনী তার বাড়ীতে গিয়ে দেখা করে জিজ্ঞেস করল যে বিয়ের ব্যাপার শেষ হয়ে গেছে কিনা । সেই মহিলা বলল যে তার বাড়ীতে তো বিয়ের কোনও ঘটনাই ঘটেনি । রোহিনী বলল, "আপনার কুটুম্বের বিয়ে ছিল সেইজন্য আপনি আমার কাছে গয়না নিতে গিয়েছিলেন না ?" সেই মহিলা বলল, "আমার এখানে কোনও বিয়েও ছিল না আর আমার কোনও গয়নারও দরকার ছিল না । আমার নিজেরই ত কত গয়না রয়েছে, আমি তোমার কাছে গয়না চাইতে যাব কেন ?" রোহিনী বলল, "আপনি আমার কাছে কতবার এসেছেন । আপনার সাথে কতবার টাকাপয়সার লেন দেন হয়েছে, আর আজ আপনি আমার সামনে এসব মিথ্যে কথা বলছেন।" তখন সেই মহিলা বলল, "বাঃ বাঃ, আমি মিথ্যে কথা বলছি না তুমি বলছ ? অমি ত নিজে সুদে টাকা ধার দিই, আমার ত টাকার কোনও অভাব নেই, আমি তোমার কাছে টাকা নিতে যাব কেন ? আমার বাড়ীতে টাকা-পয়সার সব কাজ বাড়ীর কর্ত্তারাই করে । এ বাড়ীর ছেলেরা যদি তোমার এই সব কথাবার্ত্তা শোনে তবে তোমাকে কিন্তু ভয়ানক অপমান করবে ।"

এইসব শুনে রোহিনী বড় আশ্চর্য্য হয়ে গেল । বাড়ীতে এসে কান্নাকাটি করতে লাগল । সব কাহিনী শুনে ওর বাবা এবং ভাইরা

জিজ্ঞেস করল – "তুমি যে ওই মহিলাকে গয়না দিয়েছ তার কোনও লিখিত রসিদ রেখেছ কি ? আর কেউ সাক্ষী আছে কি ?" রোহিনী বলল "আমি ত ওকে বিশ্বাস করে গয়না দিয়ে দিয়েছি কিছু রসিদ পত্রও রাখিনি আর ওই সময় কোন সাক্ষীও ছিল না।" ভাইরা জানাল যে রসিদ এবং সাক্ষী ছাড়া এর কোনও উপায়ই নেই। এইরকম কাজ আমাদের না জিজ্ঞেস করে তোমার করা উচিৎ হয়নি। গহনা-গাটি বেহাত হওয়ায় সকলেই কপাল চাপড়াতে লাগল।

একদিন এক সাধুবেশধারী ঠগ্ দেবদত্তজীর কাছে এল এবং দেবদত্তজী তার খুব সেবা শুশ্রূষা করল। শেষে সাধু জিজ্ঞেস করল – "যোগক্ষেম ঠিকমত চলছে ত ?" পণ্ডিতজী বলল, "ছোট বউ বাড়ী থেকে চলে যাবার পর বাড়ীতে ঝগড়াঝাটি অশান্তি শুরু হয়ে গেছে। সমাজে আমাদের নিন্দা হওয়াতে জীবিকাও নষ্ট হতে বসেছে। শেয়ারের কাজ কারবারে লোকসান হওয়াতে ছেলেদের কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেছে আর মোহনলালেরও কিছু যোগাযোগ হচ্ছে না।" সাধু বলল, "আমি তোমাকে একটা পদ্ধতি শিখিয়ে দিচ্ছি যাতে করে তুমি প্রতিদিন ২ রতি সোনা তৈরী করতে পারবে। কিন্তু বেশী লোভ করোনা। তুমি দোকান থেকে চার আনার সেঁকো চার আনার গন্ধক আর চার আনার পারদ নিয়ে এস। কিছু কয়লা আর একটা মুচি (সোনা গালানোর এক বিশেষ পাত্র) নিয়ে এস। দেবদত্তজী তাড়াতাড়ি সেগুলো নিয়ে এল। ওই ঠগ্ নিজের ঝোলার থেকে এক বিশেষ ধরণের পাতা বের করে তার রসে সোঁকো গন্ধক আর পারদ একত্র মিশিয়ে পণ্ডিতজীর মারফত সেই মুচিতে রাখল এবং কয়লা দিয়ে মুচির বাকি অংশ ভরে দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিল । আগুন রাখবার জন্য পণ্ডিতজী ক্রমাগত কয়লা দিয়ে যেতে লাগল । যে সময় পণ্ডিতজী কয়লা দিচ্ছিল সেই সময় ওই ঠগ্ লুকিয়ে একটি কয়লায় ছিদ্র করে তাতে দু রতি সোনা ঢুকিয়ে রেখেছিল। কয়লা দিতে দিতে যখন সেই সোনা ভরিত কয়লা মুচিতে দেওয়া হয়ে গেল তখন ঠগ্‌টি কয়লা

দেওয়া বন্ধ করতে বলল। ক্রমে ক্রমে সেঁকো,গন্ধক আর পারদ ত জ্বলে গেল কয়লাও ছাই হয়ে গেল পড়ে, রইল শুধু দুই রতি সোনা।

সোনা দেখে পণ্ডিতজীর আনন্দের আর সীমা নেই। সাধুবেশধারী ঠগ্ চলে যাওয়ার পর পণ্ডিতজী ওই সব জিনিষ অনেক পরিমাণ একত্র কিনে নিয়ে এল আর রোজ রোজ ওই কাজ করে চলল কিন্তু হয় না কিচ্ছু । এমন সময় আবার একদিন ওই সাধুবেশধারী ঠগ্ বাড়ীর সামনে দিয়ে যাচ্ছিল । পণ্ডিতজী গিয়ে তার পায়ে লুটিয়ে পড়ল আর বাড়ীতে নিয়ে এসে খুব সেবা যত্ন করল। সাধু আবার আগের মতই জিজ্ঞেস করল,যোগক্ষেম ঠিক মত চলছে কিনা । পণ্ডিতজী বলল, "আপনি ত আমাকে সবই হাতে হাতে শিখিয়ে গেলেন কিন্তু আমার ভাগ্যে কিছুই নেই ।" সাধু বলল, "ঠিক আছে, আজ আমার সামনে তুমি নিজে নিজে সব করো কোনও ভুলত্রুটী হলে আমি শুধরে দেব।" পণ্ডিতজী যখন জিনিষপত্র আনবার জন্য ভেতরে গেল সেই সময় ওই ঠগ্ এক টুকরো কাঠকয়লার মধ্যে গর্ত্ত করে দুই রতি সোনা ঢুকিয়ে রাখল । বাড়ীতে সব জিনিষই ছিল। নিয়ম মত সব জিনিষ একত্র করে পণ্ডিতজী কাঠকয়লায় আগুন দিয়ে দিল এবং প্রয়োজন মত চিমটা দিয়ে কাঠকয়লা দ্বারা আগুনটা জ্বালিয়ে রাখতে লাগল । ওই ঠগ্ দূরে বসে বসে সব দেখছিল । যখন দেখল যে সোনা ভরা কয়লাটা আগুনে দেওয়া হয়ে গেছে তখন বলল, "এক ঘন্টা হয়ে গেল আগুন জ্বলছে । এতক্ষণে সোনা হয়ে যাওয়া উচিৎ। তুমি উঠে দেখো,আর কয়লা দিও না।" একটু বাদেই কয়লা সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল। অন্য সব জিনিষ উড়ে গেল, রইল পড়ে দুই রতি সোনা । পণ্ডিতজী সোনা দেখে খুশী, বলল, "মহারাজ, এবার ত সব ঠিক ঠিক বুঝে নিয়েছি।" এর পর সেই ঠগ্ চলে গেল।

পণ্ডিতজী রোজই সেঁকো, পারদ আর গন্ধক জ্বাল দিয়ে যাচ্ছে হচ্ছে না কিছুই । দিন পাঁচ সাতেক পরে আবার সেই সাধুকে রাস্তায় দেখা গেল। পণ্ডিতজী দৌড়ে গিয়ে পায়ে লুটিয়ে পড়ল । সাধু জিজ্ঞেস

করল, "সংসারের কাজকর্ম ঠিকমত চলছে ত ?" পণ্ডিতজী বলল, "কিছু নয় । আপনি ত সবই বলে দিলেন । আমার হাত দিয়ে করিয়েও দিলেন কিন্তু হচ্ছে না কিছুই । কি ব্যাপার বুঝতেই পারছি না। আপনি সামনে থাকলে তো আপনার শক্তিতেই সবকিছু ঠিক হয়ে যায় অথচ আপনি না থাকলে আর কিছুই হয় না।" সাধু তখন বলল, "আমি ত আর রোজ রোজ আসতে পারব না। আমি এক কাজ করতে পারি যে একসাথে তোমাকে এত সোনা বানিয়ে দিয়ে যেতে পারি যে তোমার সারা জীবন চলে যাবে। তোমার বাড়ীতে যত সোনা আছে সব এনে একটা হাঁড়িতে ভরে আগুনের ওপর চড়িয়ে দাও এবং হাঁড়িটা জলে ভরে দাও। বাড়ীতে যত গন্ধক, পারদ আর সেঁকো আছে সব তার মধ্যে দিয়ে দাও আর হাঁড়ির ঢাকাটা মাটি দিয়ে আটকে দাও । এইবার ওই হাঁড়ির ওপর আর একটা হাঁড়ি জল ভর্ত্তি করে নীচের হাঁড়িটার ওপর বসিয়ে দাও । এইবার অষ্টপ্রহর ওই আগুনটা জ্বালাতে থাকবে । তারপর খুলে দেখবে সোনা দ্বিগুণ হয়ে গেছে ।"

পণ্ডিতজী খুব খুশী হয়ে নিজের স্ত্রীর সমস্ত গয়না হাঁড়ির মধ্যে ভরে যেমন বলেছে তেমনই করল কিন্তু ওপরের হাঁড়িতে জল কম পড়াতে জল আনতে বাড়ীর ভেতরে গেল । এই সুযোগে বাবাজী নীচের হাঁড়ি থেকে সমস্ত সোনা বের করে নিজের ঝোলার মধ্যে ভরে তার বদলে পাথর বালি এসব রেখে দিল আর হাঁড়িব ঢাকনা আগের মতই মাটি দিয়ে আটকে দিল । এদিকে পণ্ডিতজী জল এনে উপরের হাঁড়িতে জলটা ভরে দিল । নীচের হাঁড়িটা বাঁকা হয়েছিল তাই পন্ডিতজী সেই হাঁড়িটা ধরে সোজা করে বসিয়ে দিল । হাঁড়ির ওজন ঠিকই ছিল ।

দু-তিন ঘন্টা সাধুটি বসে রইল । তারপর সে বলল যে আগামী কাল এই সময় এসে সে হাঁড়ির মাটি খুলে দেবে এবং তখন পণ্ডিতজী দ্বিগুণ সোনা পেয়ে যাবে, এখন সে যাচ্ছে । পণ্ডিতজী প্রাণপনে রাতদিন আগুন জ্বালাতেই থাকল । পরের দিন নির্দিষ্ট সময় পার

হয়ে যাওয়ার পরও সাধু এল না। সারাদিন চলে গেল তবুও সে এল না । আসবে কোত্থেকে, সে ত নিজের কাজ গুছিয়ে নিয়ে হাওয়া হয়ে গেছে । তৃতীয়দিন পণ্ডিতজী নিজেই হাড়ির মাটি খুলে দেখে যে ভেতরে সব পাথর আর কাঁকর । খুবই দুঃখ পেল সে । আর থাকতে না পেরে বাড়ীর সকলকে ব্যাপারটা বলল, শুনে সকলেরই খুব কষ্ট হল । সাধুর অনেক খোঁজ খবর করা হল কিন্তু কোনও হদিশই পাওয়া গেল না। যাবে কোথা থেকে সে ত আর সাধু নয়, সে ত মনুষ্য সমাজে খাঁটী সাধুদের ওপর নিন্দা ডেকে আনার এক ধূর্ত্ত শিরোমণি চোর ।

একবার এক ঠগিনী ওই পাড়ায় এসে এক বাড়ী ভাড়া নিয়ে তার আড্ডা জমিয়ে বসল । মন্ত্র তন্ত্রে সিদ্ধ যোগিনী বলে নিজেকে প্রচার করে স্ত্রীলোকদের রোগ নিরাময়, পুত্র কামনা, অর্থপ্রাপ্তি, ছেলেমেয়ের বিয়ের যোগাযোগ এইসব করে বেড়াতে লাগল । যন্ত্র, মন্ত্র, তন্ত্র এই দিয়ে এক টুকরো সূতো বেঁধে দিয়ে সকলকে এক বছর থেকে দুমাস পর্য্যন্ত সময় দিতে লাগল । সরল সোজা মেয়েদের এইভাবে ঠকিয়ে টাকা-পয়সা,কাপড়, গয়না এইসব ঠকাতে লাগল।

একদিন রামদেত্তর স্ত্রী ভগবানদেবী সেই যোগিনীর প্রশংসা শুনে তার কাছে গিয়ে বলল, "মাতাজী আমার কোনও ছেলে নেই, এমন কিছু উপায় বলো যাতে এক বছরের মধ্যে আমার ছেলে হয়।" যোগিনী ওকে বলল, "এক মাসের মধ্যেই তোমার গর্ভ ধরবে । আগামী শনিবার রাত্রে আমি তোমার একটা ব্যবস্থা করব। ঐদিন রাত দশটার সময় তুমি আমার কাছে এস । জিনিষপত্র সব আমার কাছেই আছে তুমি শুধু শাড়ী গয়না পরে ষোড়শ শৃঙ্গার করে শনিবার রাত্রে আমার কাছে চলে এস ।" ভগবানদেবী শনিবার রাত্রে সাজগোজ করে সেখানে গেল। ঠগিনী ভগবানদেবীর শাড়ী গয়না সব খুলিয়ে একটা ঘরে রেখে ঘরে তালা দিয়ে সেই চাবি ভগবানদেবীর হাতে দিয়ে দিল । রাত ঠিক বারটার সময় ওই যোগিনী তেল, সিন্দুর, মাটির ঘট আর তেকাঠি নিয়ে ভগবানদেবীকে সঙ্গে নিয়ে চৌরাস্তার

মোড়ে গেল। সেখানে গিয়ে তেকাঠির ওপর মাটির ঘট লাগিয়ে তার ওপরে তেল সিন্দুর দিয়ে ভগবানদেবীকে একটা মন্ত্র বলে এক ঘন্টা ওখানে বসে জপ করতে বলল । রাত্রিবেলা বাড়ী খালি রয়েছে এই অছিলায় সে বাড়ি চলে গেল। এক ঘন্টা পর ওই ঘট নিয়ে ওর বাড়ীতে যেতে বলল ।

যোগিনী বাড়ীতে এসে ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে ঘরের তালা খুলে কাপড় গয়না সব নিয়ে চম্পট দিল । এক ঘন্টা বাদে ভগবানদেবী ওখানে গিয়ে সব দেখল, দুঃখে সে কাঁদতে লাগল । নিতান্ত লজ্জিত হয়ে বাড়ী এসে সব ব্যাপার বলল । বাড়ীর লোকেরা ওকে খুব বকাবকি করল। তারপর যোগিনীর অনেক খোঁজ খবর করা হল কিন্তু কোনও পাত্তাই পাওয়া গেল না । বাড়ীর মালিক বলল যে ওই যোগিনী তাকে এক মাসের ভাড়া অগ্রিম দিয়েছিল সে কোথায় গেছে তা সে জানে না কারণ এরকম ভাড়াটে ত তার বাড়ীতে অহরহই আসছে যাচ্ছে ।

এইসব দেখে সোমদত্তর স্ত্রী রামদেবী মনে মনে ভাবল সকলের গয়নাই ত গেল এখন বাকী রইল কেবল আমার । ছোটবৌ চলে যাবার পর থেকে রুজি রোজগার সব বন্ধ হয়ে গেছে এইবার আমার গয়না বেচে এরা সংসার চালাবে আর কোনও রাস্তাই নেই । এই ভেবে সে নিজের গয়না বাপের বাড়ীতে নিজের ছোট ভাই-এর কাছে রেখে এল। ওর বাপের বাড়ী ওই শহরেই অন্য এক পাড়ায় ছিল । ওর ভাই খুবই বদমাশ আর অকৃতজ্ঞ ছিল । ওর স্বভাব চরিত্রও ভাল ছিল না। রামদেবীর সমস্ত গয়না বিক্রী করে সেই টাকা সে নিজের ব্যবসায়ে ঢেলে দিল । কিছুদিন বাদে একদিন সে রটিয়ে দিল যে রাত্রে চোর এসে তালা ভেঙ্গে সব নিয়ে গেছে । ভোর হতেই সে কান্নাকাটি শুরু করল আর চারদিক থেকে লোকজন জড় হয়ে গেল। পুলিশও এসে গেল । ধীরে ধীরে সমস্ত শহরে খবর ছড়িয়ে গেল । রামদেবীও খবর শুনল । খবর শুনে ও দৌড়ে ভাইকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল "ভাই, আমার গয়নাগুলো ঠিক আছে ত ?" ওর ভাই ঝাঁঝিয়ে

উঠল" তোর গয়নার জন্যই ত এই বিপদ । আমার বাড়ীতে ছিল কি, যে চোরে নেবে ? আমার যৎসামান্য যা ছিল সব তোমার গয়নার সাথেই চোর তাও নিয়েগেছে।" রামদেবী কেঁদে পড়ল, "ভাই, আমার গয়নাগুলো তো ফেরত দিতেই হবে ।" ছোট ভাই খুব রাগারাগি করে ওকে তাড়িয়ে দিল, বলল, "যা এখান থেকে, আর কখনও এখানে মুখ দেখাসনি । তোর জন্যেই আমার সব বরবাদ হয়ে গেল।" রামদেবী খুবই দুঃখিতভাবে বাড়ী এসে সব কাহিনী শ্বশুরবাড়ীর লোকেদের বলল। সকলেই ওর ওপর খুব রাগারাগি করল কিন্তু করার কিছুই ছিল না ।

এইবার এরা ঠিক করল যে এখন থেকে যার যার খরচ সে তার নিজের নিজের রোজগার থেকে করবে । এই অনুসারে সোমদত্ত আর রামদত্ত নিজের নিজের স্ত্রী নিয়ে আলাদা হয়ে গেল বাকী কজন একত্রই রইল ।

(৭)

একদিন বাড়ীতে সকলে বসে কথাবার্তা বলছে সে সময় পণ্ডিত দেবদত্তজী সরলভাবে বললেন, "সামান্য একটা অপরাধের জন্য আমরা ছোটবৌকে এ বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি এটা আমাদের খুবই অন্যায় হয়েছে সেই কারণেই আমাদের এই দুর্দশা। ওই বৌ বড় ভাগ্যবতী, বুদ্ধিমতী আর বিচারবুদ্ধি সম্পন্না ছিল । সে যদি বাড়ীতে থাকত তবে আমাদের এইসব বিপদ আসত না ।" সকলেই এ কথা স্বীকার করল এবং প্রস্তাব করল যে ওর কাছে গিয়ে ওকে ফিরিয়ে আনা উচিৎ। কিন্তু চক্ষুলজ্জার জন্য কারুর সাহস হল না যে কে সুশীলার কাছে যাবে । কোনও রকমে এই সংবাদ সুশীলার কানে পৌছায় । সুশীলা মনে মনে ভাবল - আমার বাড়ীর লোক আমার কাছে আসতে চায় এতে আমার কোনও গৌবর নেই তাই আমারই উচিৎ তাদের কাছে যাওয়া ।" এই ভেবে পরের দিন সে শ্বশুরবাড়ী এসে শ্রদ্ধা, প্রেম, বিনয় এবং সরল ভাবে[১] সকলের চরণে প্রণাম নিবেদন করল

ওকে দেখে বাড়ীর লোকেরা একদিকে যেমন খুবই আনন্দিত হল অন্যদিকে তেমনই নিজেদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জায় চুপসে রইল । সুশীলা বলল, "আমি শুনতে পেলাম যে আপনারা আমার কাছে যাবার সিদ্ধান্ত করেছেন তাই আমিই নিজে আপনাদের কাছে এলাম । কারণ আমি ত আপনাদের সকলের ছোট। তাই আমারই আপনাদের কাছে আসা উচিৎ মনে করলাম । মধ্যে মধ্যে প্রায়ই আমার মনে হত আপনাদের কাছে চলে আসি কিন্তু আপনারা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন তাই সাহস পেতাম না, আমার এই অপরাধের জন্য আমি ক্ষমা ভিক্ষা করছি ।

পণ্ডিতজী বললেন, "মা, তোমার অপরাধ ত একটা অতি তুচ্ছ ব্যাপার ছিল আমরা তার চেয়ে অনেক অনেক বড় অপরাধ করেছি।" পণ্ডিতজী ত আর জানতেন না যে বৌ-এর কোনও অপরাধই ছিল না, ওটা কেবল একটা ষড়যন্ত্র মাত্র । সংসারের দুরাবস্থায় এবং একটার পর একটা বিপদে ষড়যন্ত্রকারী মেয়েদের মনে পাপের ভীতি, প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল। তাদের মন থেকে ঈর্ষ্যা চলে গিয়ে অনুতাপের আগুন জ্বলছিল । সকলেই অনুতপ্ত হচ্ছিল এবং মনে মনে বুঝল যে তাদের দুর্দশার একমাত্র কারণ নির্দোষ সুশীলার ওপর তাদের অন্যায় অত্যাচার । তাদের অনুতাপের তপ্ত অশ্রু তাদের চোখেই বইতে লাগল। অতঃপর সোমদত্ত এবং রামদত্তের স্ত্রীরা কাঁপতে কাঁপতে হাত জোড় করে অতিকষ্টে শাশুড়ীকে বলল, "ছোট বৌ-এর কোনও অপরাধই ছিল না। আমরা হিংসা করে ওর ওপর মিথ্যা কলঙ্ক দিয়েছিলাম আর তার প্রতিফল আমরা ভালভাবেই পাচ্ছি।" তখন রোহিনী অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে লাগল, "ছোটবৌদির ত কোনও দোষই নেই এমনকি বৌদিদেরও তেমন কোনও দোষ নেই । সমস্ত ষড়যন্ত্র আর নষ্টামি ত আমার । আমিই বৌদিদের বালা, হার, নিজের সাড়ী আর ঘাগড়ী থলের মধ্যে ভরে সেটা সেলাই করে ঠাকুরের হাত দিয়ে সেই বুড়ীব কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম আর ওই চিঠিও তো আমিই লিখেছিলাম আর বাবার কাছে মিথ্যে নালিশও আমিই

করেছিলাম, এই সমস্ত নষ্টের মূল আমি । আজ আমি অনুতাপের আগুনে জ্বলে মরছি । ধরণী যদি দ্বিধা হয় তাহলে আমি তার মধ্যে আশ্রয় নিই। এই নিষ্পাপ পবিত্র বৌদির কাছে ক্ষমা চাইবার মুখও আমার নেই ।"

এইসব সত্য ঘটনা শুনে সুশীলার হৃদয় গলে গেল । সে যুক্ত করে বিনয় সহকারে সকলকে বলল, "যা কিছু হয়েছে সব আপনারা মন থেকে মুছে ফেলুন । আমি তো আপনাদের কোনও দোষই দেখি না তাহলে ক্ষমা[২২] কিসের ?" এই কথা শুনে সুশীলার স্বামী মোহনলাল ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল আর নিজের কৃত দুস্কৃতির জন্য বারবার অনুতাপ করে বলতে লাগলো, – "আমি ধোকার জন্য মারা গেলুম। আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি ?" সুশীলা বলল, "স্বামিন্, আপনি কোনও ব্যাপারে চিন্তা করবেন না – এসব তো আমার পূর্বকৃত পাপের ফল । আপনাদের কারোর কোনও দোষ নেই । এখন আপনারা এইসব পুরানো স্মৃতি ভুলে যান আর আমাকে আগের মতই আপনাদের সেবিকা মনে করুন । আমার যা কিছু সম্পত্তি সব আপনাদেরই । আপনি সেই সম্পত্তি এখানে আনিয়ে নিন ।"

এই কথা শুনে সকলে বিশেষভাবে লজ্জিত হয়ে বলল, "তোমার সব জিনিষ আমরা কি করে আনাব ?" সুশীলা বলল, "ওই সবই তো আপনাদেরই, আমিও আপনাদেরই । সবকিছু ভগবান আমাদের মঙ্গলের জন্যই করেছেন কারণ এ না করলে আজ ওই সম্পত্তি আর মাসিক হাজার টাকা নিয়মিত ব্যবস্থা কি করে হত ?" এই কথা বলে সুশীলা তার সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি নিজের লোক দিয়ে সেখান থেকে আনিয়ে নিঃস্বার্থভাবে শ্বশুরের চরণে সমর্পিত করল[১৩] । তার অন্যান্য সব কাজ কর্মও শ্বশুর বাড়ী থেকেই চালাতে লাগল আর সে নিজেও শ্বশুর বাড়ীতে থাকতে লাগল । সুশীলার এই পবিত্র ব্যবহার[২৪] দেখে সকলে মুগ্ধ হয়ে গেল।

বাইরের থেকে খেলাধূলা করে ইন্দ্রসেন আর ইন্দ্রসেনী বহুদিন পরে মাকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে ভূমিষ্ঠ হয়ে মাকে প্রণাম করল । মাও তাদের আদর করে বুকে জড়িয়ে ধরল । ঠাকুর আর চাকর নিজেদের ভীষণ অপরাধে কাঁপছিল আর মাটিতে মিশে ছিল। তাদের সারা শরীর থেকে ঝরঝর করে ঘাম ঝরতে লাগল আর চোখ দিয়ে অনুতাপের উষ্ণ অশ্রু গড়াতে লাগল । ওদের এই নীরব অনুতাপ দেখে সুশীলা ওদের আশ্বাস দিয়ে শান্ত করল । এখন ওদের দুজনের জীবনও বদলে গেছে।

তখন সুশীলা বলল, "আমি শুনেছি আমার দুই ভাসুর এবং বড় জা আলাদা থাকছেন এটা আমার ভাল লাগছে না। তাঁরা যেন দয়া করে আগের মত একত্র আমাদের সাথেই থাকেন ।" তারা সুশীলার এই উদারতা দেখে চমৎকৃত হয়ে গেল এবং 'না' করতে পারল না। সেই থেকে সকলে একত্রই থাকতে লাগল । সুশীলার প্রভাবে পড়ে সকলেই সদাচারী আর সচ্চরিত্র হয়ে গেল। ওর নামে যা কিছু অপবাদ ছড়ানো হয়েছিল সব দূর হয়ে গেল । ওদের সংসার সব লোকের কাছে আদর্শ সংসার হয়ে গেল ।

(৮)

সুশীলা সকলের সাথে সমান ব্যবহার করত । যা কিছু খেতো বা পরতো তা বাড়ীতে সকলকে সমানভাবে দিয়ে খেত এবং পরতো। খাওয়া দাওয়া,কাপড় চোপড়ে ওর মধ্যে ভেদাভেদ ছিল না । নিজের স্বামী, ছেলে, মেয়েকে যা খাওয়াতো পরাতো সেই জিনিষই ভাশুর, জা, শাশুড়ী, ননদ সকলকে খাওয়াতো ।

একদিন সুশীলা নিজের ছেলে মেয়েকে কাজু, বাদাম, কিস্‌মিস্‌, পেস্তা এসব খাওয়াচ্ছিল । এমন সময় ওদের কয়েকজন খেলার সাথী বাড়ীতে এসে গেল । সুশীলা নিজের ছেলে মেয়েদের আগে না দিয়ে তাদের ওই সব আগে দিল আর নিজের ছেলে মেয়েকে যতটা দিয়েছিল ওদেরও ততটাই দিয়েছিল, আর তার মধ্যে ভাল ভাল জিনিষগুলো

বাইরের ছেলেদের দিল আর বাকীটা নিজের ছেলে মেয়েকে দিল । সুশীলার এই ব্যবহারে তার ছেলে মেয়েদের আর্দশ শিক্ষা হল । ওরা এমনিতেই খুবই ভাল ছিল । তখন ওরা নিজেরাই ওদের নিজেদের থেকে অর্দ্ধেক অংশ নিজেদের সাথীদের দিল। সৎ সুশীলার মত মায়ের সন্তানদের উপযুক্ত ব্যবহারই বটে !

সুশীলা নিজের স্বামীকে বিশেষভাবে সেবা করত আর কখনও কখনও তার সাথে পাঠ, ব্যাখ্যা শুনতে যেত । সঙ্গে ওর ছেলে মেয়েদেরও নিয়ে যেত। শিশুরা এমনিতেই চঞ্চল কিন্তু এই শিশুরা শান্ত স্বভাবের ছিল, কারণ সুশীলার স্বভাব এমনিতেই চাঞ্চল্যরহিত[২০] ছিল । তারা শান্তভাবে চুপচাপ বসে ব্যাখ্যান শুনত। সুশীলা নিয়মিতভাবে ছেলে মেয়েকে সৎশিক্ষা দিত । বলত, "সূর্য্যোদয়ের আগে ঘুম থেকে উঠবে, রোজ গুরুজনকে প্রণাম করবে, মিথ্যা,কপটতা,প্রবঞ্চনা, হিংসা, চুরি এসব কখনও করবে না। সর্বদা সত্য বলবে, কাউকে নোংরা কথা বলবে না, নিজেদের মধ্যে লড়াই মারামারি, গালাগালি করবে না, সূর্য্যনারায়ণকে রোজ অর্ঘ্য প্রদান করবে, কোনও জিনিষ ভগবানকে উৎসর্গ না করে খাবে না। সকলকে সেবা করা, বাজারের খাবার না খাওয়া, বিড়ি, সেগারেট, তামাক, সিদ্ধিগাঁজা ইত্যাদি মাদক বস্তু কখনও সেবন করবে না; নাটক, সিনেমা, ক্লাব ইত্যাদিতে কখনও যাবে না, কথা-কীর্ত্তন, সৎসঙ্গে শান্তভাবে সব শুনবে, কোনও জিনিষ পেলে সামনে উপস্থিত বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ করে খাবে, গুরুজনদের আজ্ঞা পালন করবে আর সর্বদা কর্ত্তব্যপরায়ণ থাকবে । কখনও কারুর বাড়ীতে গিয়ে কিছু চাওয়া তো দূরের কথা কিছু দিলে তাও না নেওয়া উচিৎ। নিজের দ্বারা যেটুকু সম্ভব অপরের সেবা করবে,কখনও অন্যের সেবার পাত্র হবে না । শিশুদের জন্য কি সুন্দর সব শিক্ষা!

এইভাবে বাড়ীতে নিত্য নিয়মিতভাবে উপদেশবাণী এবং কথা কীর্ত্তন হত। এর ফলে শিশুদের ওপর এবং বাড়ীব সকলের ওপর খুব সুন্দর প্রভাব পড়তে লাগল আর সকলেই সুশিক্ষিত হতে লাগল।

একদিন সুশীলার বাবা পণ্ডিত গোবিন্দরাম সুশীলাকে নেবার জন্য লোক দিয়ে শ্বশুরকে বলে পাঠাল – "আমার এক প্রার্থনা যে অনেকদিন হয়ে গেল সুশীলা গেছে অতএব দয়া করে একবার ছেলেমেয়ের সঙ্গে ওকে যদি পাঠিয়ে দেন।" সংবাদ শুনে সুশীলাও সরলভাবে নিবেদন করল যে – অনেকদিন হয়ে গেছে বাবা মায়ের সাথে দেখা হয়নি তাই যদি অনুমতি করেন তবে বাপের বাড়ী গিয়ে তাদের দেখে আসি আর কয়েকদিন সেখানে থেকে আসি । শ্বশুর শাশুড়ী খুব প্রসন্ন মনেই অনুমতি দিল আর বলল যে বেশীদিন যেন দেরী না করে কারণ সুশীলাকে ছাড়া তাদের কষ্ট হবে । এই বলে বিশ্বাসী লোকের সাথে সুশীলাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিল ।

ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাপের বাড়ী পৌঁছে সুশীলা পিতামাতার চরণে প্রণাম করল । তারা বাড়ীর কুশল প্রশ্ন করল। সুশীলা বলল, "ভগবানের কৃপায় সব কুশলেই আছে কিন্তু আমি এ বাড়ীতে আমার ভাই রামলাল আর ভাইবৌকে দেখছি না ত, কি ব্যাপার ?" পণ্ডিত গোবিন্দরামজী জানাল – "কিছুদিন হল বাড়ী ভাড়া করে ওরা আলাদা আছে । যা কিছু রোজগার করে নিজেরা খায় দায় আর বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে ফূর্তি করে । আমরা ত এখন বুড়ো হয়ে গেছি, রোজগারের ক্ষমতা নেই, আগের যা কিছু ছিল সেই সব বিক্রী করে দিন চালাচ্ছি ।" সুশীলা জিজ্ঞেস করল যে বৌদির কথায়ই দাদা অলাদা হয়ে গেল না অন্য কোনও কারণ আছে ।" মা বলল, "না মা, বৌ ত খুবই সৎ বংশের মেয়ে, আমি কখনও ওকে কিছু বললেও সে অসন্তুষ্টও হত না বা রাগ করত না । ওর স্বভাব খুবই শান্ত, কলহ কাকে বলে তা সে জানেই না । কেউ ওকে দু চার কথা শুনিয়ে দিলেও সে হেসে উড়িয়ে দিত । এখনও সে মাঝে মাঝে আমার হয়ে রামলালকে সুবুদ্ধি দেবার চেষ্টা করে । ওর স্বভাব, সেবা এবং তার থেকে দূরে থেকে আমি মাঝে মাঝে প্রায়ই কাঁদি । রামলালও খুবই ভাল ছিল

কিন্তু আজকালকার বখাটে ছেলেদের সঙ্গে মিশে ও আমাদের থেকে আলাদা হয়ে গেছে ।

সুশীলা বলল, "মা, আমি যদি দাদা-বৌদিকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে এখানে নিয়ে আসতে পারি তবে তোমার কি মত ?" মা বলল, "যদি এটা করতে পারিস মা, সে তো আমার খুবই সৌভাগ্য ।"

দাদা রামলাল প্রয়াগ শহরেই অন্য এক অঞ্চলে থাকত । সুশীলা ওদের একজন আত্মীয়কে নিয়ে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে করে দাদার ওখানে গেল। রামলাল বাড়ী ছিল না, বৌদি ছিল । সুশীলাকে আসতে দেখে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে খুব আদর করে অভ্যর্থনা করল । সুশীলাও ছেলেমেয়েদের নিয়ে পায়ের ধূলো নিল । বৌদি একটু ইতস্ততঃ করছে দেখে সুশীলা বলল, "অপনি গুরুজন হওয়াতে আমার মায়ের সমান সুতরাং আপনি সংকোচ করছেন কেন ? গুরুজনের চরণে প্রণাম করা ছোটদের তো কর্ত্তব্যই ।" বৌদি লজ্জিত হয়ে বলল, "বোন, তুমি মার কাছে এসেছ আমি সে খবর পেয়েছি কিন্তু দুঃখের কথা যে তোমার দাদার ভয়ে আমি যেতে পারিনি ।" সুশীলা বলল, "এর জন্য আপনার মনে কোনও সংকোচ হওয়া ঠিক নয় । মা তো আপনার সেবা স্মরণ করে ভূরি ভূরি প্রশংসা করতে করতে আপনার বিচ্ছেদে কান্নাকাটি করছে।"

ইতিমধ্যে দাদা রামলাল এসে পড়ল । সুশীলা তৎক্ষণাৎ ছেলেমেয়েদের নিয়ে দাদার চরণে প্রণাম করল । রামলালও সুশীলার সাথে খুব আদর ভালবাসার সাথে কথাবার্ত্তা বলল । কুশল বিনিময়ের পরে সুশীলা বলল, "দাদা, আজ মা-বাবার থেকে তোমাকে আলাদা দেখে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে । রামলাল বলল, "বোন, তোমার আসার খবর আমি পেয়েছি। তোমার সঙ্গে দেখা করার ভীষণ ইচ্ছা করছিল কিন্তু মনে ভাবলাম যে যদি ও বাড়ীতে যাই তবে মা-বাবা আমাকে অপমান না করে বসে আর তোমাকেও এখানে আসতে বলিনি কারণ যদি ওঁরা তোমাকে আসতে না দেয় ।" সুশীলা বলল, "দাদা এতে

তোমার কোনও দোষ নেই । এতো আমারই দোষ যে আমি গতকালই তোমার সঙ্গে দেখা করিনি । যাই হোক, দাদা আমি যখন শ্বশুর বাড়ী যাই তখন তো তোমরা দুজনেই মা-বাবার সেবা এবং খুব আজ্ঞাপালন করতে । তোমাদের সেই গুণাবলীর চিন্তা করে আমার অবাক লাগে যে তোমরা ওখান থেকে আলাদা হয়ে কি করে থাকছ ? আমার ব্যবহারে ভুলকত্রুটী দেখে তুমি তো আমাকে শিক্ষা দিতে, সে কথা আজও আমার মনে রয়েছে।"

রামলাল বলল, "বোন, তোমার কথা শুনে আমার মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে । আমার আলাদা হওয়ার কারণ হল যে আমার বন্ধু বান্ধবরা যারা আমার কাছে আসত, মা-বাবা তাদের ভাল চোখে দেখত না । এইসব দেখে ওদের খুব কষ্ট হত আর ওরা পরামর্শ দিল যে সবকিছু মা বাবার কাছে ছেড়ে দিয়ে আমি যেন আলাদা হয়ে যাই, এতে আমার কোনও নিন্দা হবে না, লেখাপড়া জানি,টাকা রোজগার করার যোগ্যতা আমার রয়েছে সুতরাং বাবা-মায়ের অর্থের ওপর নির্ভর করে থাকা আমার ঠিক নয়। ওদের এইসব পরামর্শে প্রভাবিত হয়ে আমি মা-বাবা থেকে আলাদা হয়ে আছি । বোন, তুমি ত সবই বোঝ তুমি তোমার নামের মতই গুণবতী, সুতরাং তুমি বলো আমার কি করা উচিৎ।

এইসব শুনে সুশীলা খুবই কোমল মৃদুতাপূর্ণ[১৮] বাক্যে বলল, "দাদা, আমি বলব তুমি কি করবে ? আমার যা কিছু ভাল আজ দেখা যাচ্ছে সবই তো তোমারই শিক্ষার গুণে । আমি যদি কিছু বলি তবে সে তো তোমারই শেখানো কথাই বলব । আমি যখন ছোট ছিলাম তখন তুমি আমাকে শিখিয়েছিলে যে শত শতবর্ষ ধরে মাতাপিতার সেবা করেও মানুষ তাদের ঋণ শোধ করতে পারে না । মাতাপিতার সেবাই পরম ধর্ম, আর সব উপধর্ম* আজ তোমাকে

---

*মনু বলেছেন

যং মাতাপিতরৌ ক্লেশং সহেতে সম্ভবে নৃণাম্।
ন তস্য নিষ্কৃতিঃ শক্যা কর্তুং বর্ষশতৈরপি ।। (২/২২৭)

পিতামাতার থেকে আলাদা দেখে আমার বড় অবাক লাগছে আর তোমার বন্ধু বান্ধবদের সম্বন্ধে মা-বাবা যা বলেছেন তাও তোমারই মঙ্গলের জন্যই বলেছেন । যে বন্ধু বান্ধব বাপ-মার কাছ থেকে দূরে থাকতে পরামর্শ দেয় তাদের সংসর্গ কোন কাজে লাগে ? ওই সব বন্ধ বান্ধর যদি সত্যিই বুদ্ধিমান হত তাহলে সহজে মুক্তিপ্রাপ্তির উপায়রূপ পরম কল্যাণকারী মাতাপিতার সেবা থেকে তোমাকে বঞ্চিত করছে কেন ? তোমার এই চিন্তা করা উচিৎ ছিল যে এরা এইরকম করে নিজেদের মতলব সিদ্ধ করতে চায়, না সত্য-সত্যই তোমার ভাল চায় । দাদা ! বাবা মা তো তোমার বিচ্ছেদে তোমার গুণ এবং সেবার কথা স্মরণ করে কেঁদে আকুল হচ্ছে । সমাজে তোমার গুণ এবং সেবার খ্যাতি রয়েছে আর ভাল ভাল লোকের উপরে তোমার গুণাবলীর প্রভাব রয়েছে । তুমি বাবা মার কাছ থেকে আলাদা হযে রয়েছ এতে সে সব লোকেরা কি মনে করছে ? তারা যখন তোমার নিন্দা সমালোচনা করবে তখন তুমি কিভাবে সে সব সহ্য করবে ? মা বাবার অর্থে তোমার সঙ্কোচ বা ঘৃণা হওয়া কি উচিৎ ? মাতাপিতার থেকে আমরা কি করে দূরে থাকতে পারি ? আমাদের শরীরে যা কিছু আছে সবই তো মাতাপিতার। আমার তো মত এই যে মা-বাবার কাছে গিয়ে তাদের চরণ ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিৎ এবং এতে বিলম্ব করা উচিৎ নয় । মা-বাবার যদি কোনও ত্রুটীও থাকে তবুও গুরুজনদের ত্রুটী বিচার করা উচিৎ নয় ।"

"মানুষের জন্মের সময় মাতাপিতা যে ক্লেশ সহ্য করেন শত শতবর্ষ ধরে সেবা ইত্যাদি করেও তার প্রতিদান দেওয়া যায় না।" **অতএব**

ত্রিষ্বেতেষ্বিতিকৃত্যং হি পুরুষস্য সমাপ্যতে।
এষ ধর্মঃ পরঃ সাক্ষাদুপধর্মোঽন্য উচ্যতে।।(২/৩৩৭)

"মাতাপিতা আর আচার্য্য, এই তিনের সেবাতেই পুরুষের সব কর্ত্তব্য সমাপ্ত হয় অর্থাৎ তার আর অন্য কোনও কর্ত্তব্য বাকী থাকে না।

এইই সাক্ষাৎপরম-ধর্ম এ ছাড়া অন্য সব কিছুকে উপধর্ম বলা হয়।

এই সময় বৌদি বলল, "ঠাকুরঝি , শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর থেকে আলাদা থেকে না তো আমার কোনও সুখ হচ্ছে, না আমার মন ভাল লাগছে। মাঝে মাঝে তোমার দাদাকে আমি অনুরোধও করি, কিন্তু জানিনা ভগবান কেন আমাকে তাদের সেবাসুখ থেকেবঞ্চিত রেখেছেন!" রামলাল বলল, "বোন, মা-বাবা না ডাকলে বা তাদের সম্মতি না পেলে যেতে বড় লজ্জা করে । মনে হয় আমাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেবে নাতো ?" সুশীলা বলল, "দাদা ওদের সম্মতি তো রয়েছেই । ওরা তো তোমাদের জন্য কান্নাকাটি করছে, তাদের কাছে যেতে লজ্জা কিসের ? আমার তো মনে হয় তোম'রা গেলে তাঁরা খুবই খুশী হবে। আর মা-বাবার কাছে যাওয়ার ব্যাপারে অপমানের কথা আসে কোথা থেকে ? তাদের দেওয়া অপমান তো মানের চেয়েও বড়।*

সুশীলার এই হিতৈষীতাপূর্ণ সৎপরামর্শ শুনে রামলাল আর স্ত্রী দুজনে মিলে সুশীলার সাথে বাবা-মার কাছে এসে নিজেদের গর্হিত কর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তাদের পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগল ।

বাবা-মা বললেন, "বাবা আজ বড় সৌভাগ্যের কথা, আজকের দিন আমাদের বড়ই শুভদিন ।" পরে সুশীলাকে বললেন, "মা সুশীলা, তুমি আজ যে মহৎ কাজ করলে এ আমরা জীবনে কোনও দিন ভুলব না ।" সুশীলা জবাব দিল, "মা তুমি কি বলছ ? এর যা কিছু কৃতিত্ব

---

* কবির ভাষায় –

গীর্ভির্গুরুণাং প'রুষাক্ষরাভিস্তিরস্কৃতা যান্তি নরা মহত্ত্বম্ ।

অলব্ধশাণো ত্কষণা নৃপানাং ন জাতু মৌলৌ মণয়ো বসন্তি ।।

"মানুষ যখন কঠোর বাক্যে গুরুজনদের দ্বারা অপমানিত হয় তখনই সে মহত্ত্ব প্রাপ্ত হয় নয়ত নয়, যেমন অতি উত্তম রত্নও যতক্ষণ না পাথর দিয়ে ঘষে উজ্জ্বল করা হয় ততক্ষণ সে রাজার মুকুটে স্থান পায় না।"

সবই তো তোমার, বাবার, দাদার আর বৌদির । আমি তো নিমিত্তমাত্র, আমার মধ্যে যা ভাল তোমারা দেখতে পাও তার সবই তো তোমাদের কৃপা ।"

সুশীলার এইরকম নিরাভিমান[২৬] ব্যবহার দেখে সকলেই অত্যন্ত তৃপ্ত হল । সুশীলার হাতে দুটো মোহিনী মন্ত্র ছিল যা দিয়ে সে যে কোনও লোককে, সে যেই না কেন হোক, নিজের অনুকূলে নিয়ে আসতে পারত । সেই মন্ত্র দুটি হল – (১) নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে সর্বপ্রকারে নিস্কামভাবে তার মঙ্গলের চেষ্টা করা, আর (২) তার দোষত্রুটীকে ভুলিয়ে দিয়ে তার গুণাবলীর কীর্ত্তন । এর দ্বারা সে তার নিজের দাদার হৃদয়ও বদলে দিল ।

এর পরে রামলাল নিজের বন্ধুদের নম্রবিনয় সহকারে জানিয়ে দিল যে যখন সুযোগ হবে তখন তোমাদের বাড়ী গিয়ে তোমাদের সঙ্গে দেখা করব, মা-বাবার সামনে তোমাদের উপযুক্ত আপ্যায়ন করা সম্ভব হবে না।

সুশীলা কিছুদিন বাপের বাড়ী ছিল কিন্তু কোনও দিন কারুর কাছে শ্বশুরবাড়ীতে তার ওপর যে অত্যাচার হয়েছিল তা নিয়ে নিন্দা-চুকলী[১৫] করেনি । মা, বাবা, দাদা, বৌদি তার খাওয়া পরার জন্য অনেক কিছু দিত কিন্তু তাদের অত্যধিক আগ্রহ সত্ত্বেও সুশীলা তা গ্রহণ করত না । কখনও যদি তাদের সন্তুষ্টির জন্য যৎকিঞ্চিৎ কিছু গ্রহণ করত তাও অনাসক্তভাবেই গ্রহণ করত । ওই সব জিনিষের প্রতি ওর বিন্দুমাত্রও অসক্তি বা লোলুপতা[১৭] থাকত না । তার ব্যবহারও অত্যন্ত ত্যাগপূর্ণ এবং প্রশংসনীয় ছিল।

এরপরে শ্বশুরবাড়ী থেকে আদরের তাগাদা আসাতে মাকে স্নেহ এবং বিনয় সহকারে বুঝিয়ে তাদের বিয়োগ ব্যথায় ব্যথিত করে একজন বিশ্বাসী লোকের সাথে নিজের শ্বশুরবাড়ীতে চলে এল । শ্বশুরবাড়ী আসাতে বাড়ীর সকলেই খুব আনন্দিত হল ।

এদিকে সুশীলার মেয়ে ইন্দ্রসেনী বার বছরের হল এবং বিবাহযোগ্যা হওয়াতে সুশীলার শ্বশুর-শাশুড়ী অত্যন্ত চিন্তান্বিত হয়ে পড়ল। একদিন তারা ছোটবৌকে বলল, "ইন্দ্রসেনী বিবাহযোগ্যা হয়েছে । তোমার সুখ্যাতির দরুণ অনেকেই আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে চায় এ বিষয়ে তোমার কি অভিমত ? সুশীলা ওর শাশুড়ীকে বলল, - "এই ব্যাপারে আমার আবার কি অভিমত ?" আপনারা যেখানে সম্বন্ধ করবেন আমাদের তাতেই আনন্দ হওয়া উচিৎ। আমি তো আপনাদের কাছেই শুনেছি যে ছেলে গরীব হতে পারে কিন্তু তার বল, বিদ্যা, বুদ্ধি, যোগ্যতা, আচরণ, স্বভাব আর চরিত্রই আসল । তার আত্মীয় পরিজন বিশেষতঃ পিতামাতার স্বভাব চরিত্র ভাল হওয়া দরকার ।" এসব শুনে সকলেই খুব খুশী হল ।

ইন্দ্রসেনীর প্রারব্ধ আর সুশীলার খ্যাতিতে সুশীলার ইচ্ছামত ঘরের ছেলের সাথেই সম্বন্ধ স্থির হয়ে গেল । পণ্ডিত দামোদর শাস্ত্রীব পুত্র শিবকুমারের সাথে ইন্দ্রসেনীর বিবাহের বাগ্‌দান পর্ব হয়ে গেল। দামোদর শাাস্ত্রীর সুশীলার ওপর অত্যন্ত শ্রদ্ধা ছিল তাই সে নিজের স্ত্রীকে বিবাহের বিষয়ে পরামর্শের জন্য সুশীলার কাছে পাঠাল । বাড়ীতে আসামাত্রই সুশীলা দামোদর শাস্ত্রীর স্ত্রীকে যথোপযুক্ত অভ্যর্থনা করল । তিনি বললেন, "আপনার সাথে সম্বন্ধ হওয়ায় এই বিবাহ একটি আদর্শ বিবাহ রুপে হওয়া উচিৎ । আপনার বাড়ীতে কুপ্রথা এবং ফালতু কাজে খরচ নিশ্চয়ই হবে না, আমরাও নিজেদের শোধরানোর জন্য আপনার নির্দেশমত করতে চাই।" এইরকম আগ্রহ আর শ্রদ্ধার সাথে কথাবার্ত্তা হওয়াতে সুশীলা বলল, "আতসবাজী, হৈ হল্লা সিনেমা, থিয়েটার, আলোর রোশনী এইসবে শুধু শুধু টাকা খরচ করা ঠিক হবে না । বিয়েতে খেমটা খেউড়, অশ্লীল গীত, দাবা-তাস খেলা, অনাবশ্যক বাদ্য এইসবও করা ঠিক হবে না । বড় বড় বিদ্বান পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ করে বিধিনিয়ম অনুসারে বিয়ের কাজ

হওয়া উচিৎ, খুব বেশিলোকের ভীড়ও হওয়া ঠিক নয় । এই ব্যাপারে আমার কি কর্ত্তব্য দয়া করে বলুন।"

পণ্ডিত দামোদরজীর স্ত্রী বললেন,"আমি আপনাকে কি নির্দেশ দেব ? আমরা তো আপনারই শিক্ষামত চলতে চাই । এই ব্যাপারে আপনি কি স্থির করেছেন তা জানবার জন্য আমরা উৎসুক রয়েছি। যদি উচিৎ মনে করেন তবে এ বিষয়ে আমাদের পরামর্শ দিন ।"

তখন সুশীলা বলল, "হাসি-তামাসা, নাচ, গান, অশ্লীল গীত প্রভৃতি এসব তো আমাদের বাড়ীতে অনেকদিন হয় বন্ধ হয়ে গেছে। গাঁজা সিদ্ধি তামাক এসব মাদকদ্রব্য, সোড়া লেমনেড, হোটেলে খাওয়া, পার্টি দেওয়া, সেন্ট মাখানো এসব শাস্ত্রবিরুদ্ধ তো বটেই বরং আপ্যায়নের নামে এগুলো আপ্যায়নের অপব্যবহার এবং এগুলি অপসারিত হওয়া দরকার । শাস্ত্র অনুযায়ী গায়ে হলুদ করার পরে বিধিসম্মতভাবে দেবপূজা করে বিদ্বান পণ্ডিতদের নির্দেশ অনুযায়ী কন্যাদান করার ইচ্ছা রয়েছে । আপনাদের সত্যিকারের আপ্যায়ন তো স্নেহ ভালবাসা আর সৌহার্দ্দ্যপূর্ণ ব্যবহার দ্বারাই হয় আর আমরা এর অযোগ্য, খাওয়া দাওয়ার সাধারণভাবেই ব্যবস্থা করেছি । পণ দেবার জন্য আমার কিছুই নেই আমি তো একটি অবোধ বালিকাকে আপনাদের সেবায় অর্পন করে নিজেকে পবিত্র করতে চাই । আপনাদের মত সরল এবং ত্যাগী পরিবারের সঙ্গে সমন্ধ আমার অনেক সৌভাগ্যের ফল। আপনাদের ব্যবহার দেখে আমরা মুগ্ধ হয়ে রয়েছি ।

এরপর নির্দিষ্ট সময়মত দুতরফের শ্রদ্ধা, বিনয় আর সৌহার্দ্দ্যের মধ্যে উপযুক্ত নিয়মে খুবই সুন্দর সাত্ত্বিক আর আদর্শ বিয়ে হয়ে গেল এবং পরস্পর নমস্কার বিনিময়পূর্বক বরযাত্রী বিদায় হয়ে গেল।

সোমদত্ত, রামদত্ত আর মোহনলাল তিন ভাই সুশীলার স্থাপিত প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম নিজেরাই মিলেমিশে দেখাশোনা করত এবং তাদের নিজেদের মধ্যে খুবই ভাল সম্পর্ক ছিল ।

বাড়ীতে সুশীলার প্রভাবে মেয়েদের মধ্যে পরস্পরের ব্যবহারও সুন্দর হয়ে গিয়েছিল । এইভাবে কিছুদিন পরে সুশীলার ছেলে ইন্দ্রসেনের বয়স যখন ষোল বছর হল তখন বিবাহের যোগ্য হওয়াতে পণ্ডিত রঘুনাথ আচার্য্যের কন্যা গায়ত্রীর সাথে তার বিয়ে হয়ে গেল। এই বিবাহও আগের মতই সাত্ত্বিক, আদর্শ এবং প্রশংসনীয় হয়েছিল। এখানেও অশ্লীল নাচ গান, কু-রীতি রেওয়াজ ফালতু খরচ একেবারেই করা হয়নি । তার বদলে ত্যাগ ভালবাসা শ্রদ্ধায় ভরা ছিল । পণ্ডিত রঘুনাথ আচার্য্যের বিশেষ পীড়াপীড়িতে নামমাত্র পণ গ্রহণ করা হয়েছিল ।

ছেলে এবং মেয়ের এইরকম বিয়ে হওয়াতে বাড়ীর লোকেরা নিশ্চিন্ত হয়ে সুখে শান্তিতে বাস করতে লাগল ।

(১১)

কিছুদিন পরে শ্বাসরোগে পণ্ডিত দেবদত্তের শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ল। অনেক আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায়ও কোনও ফল হল না । রাতদিন সুশীলার অক্লান্ত সেবায় মুগ্ধ হয়ে দেবদত্তজী বললেন, "মা তুমি একেবারে নির্দোষ ছিলে কিন্তু আমি তোমাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম এই দুঃখ আমার হৃদয়ে শূলের মত বিঁধে রয়েছে ।" সুশীলার ননদ রোহিনীকে দিয়ে বলল যে ওই ব্যাপারে শ্বশুর মশাইয়ের ত কোনও দোষ নেই । সব জিনিষটাই ভুলের জন্য হয়েছে । ওই ব্যাপারে ওঁর মনে কোনও চিন্তাই করা উচিৎ নয় । আমি যে সকলের থেকে আলাদা হয়ে বহুদিন থেকেছি এও তো আমারই দুর্ভাগ্য । এখন এ নিয়ে যদি শ্বশুর মশাই দুশ্চিন্তা করেন তবে আমার মনে তার বিপরীত প্রতিক্রিয়া হবে । তখন পণ্ডিতজী বললেন, "মা, তুমি কোনও চিন্তা করো না । তোমার কথা শুনে আমার মনে এখন আর কোনও দুঃখ নেই ।

এরপরে পণ্ডিতজীর শরীর আরও খারাপ হয়ে পড়ল । এইসব দেখে বাড়ীর লোকেরা একটি স্থানকে ঝেড়ে পুঁছে পরিস্কার করে পবিত্র

জলে ধুয়ে গোবর আর গঙ্গাজল দিয়ে নিকিয়ে,তিল আর সরষে দিয়ে ভগবানের নাম লিখল । তার ওপর বালি দিয়ে শয্যা বানিয়ে, গঙ্গাজল ছিটিয়ে তারপর 'রাম'নাম লিখল এবং মন্ত্র দ্বারা গঙ্গাজল দিয়ে তার মার্জ্জনা করল । সেই বালির উপর কুশ বিছিয়ে তার উপর হাতে তৈরী শুদ্ধ সাদা কাপড় পেতে দিল । তারপর পণ্ডিতজীর সঙ্কেত অনুসারে সোমদত্ত তাঁকে পবিত্র জলে স্নান করিয়ে নতুন শুদ্ধ বস্ত্র এবং উত্তরীয় পরিয়ে তাঁর পৈতে বদলে দিল । এরপর তাঁকে ওই বালুশয্যায় শুইয়ে দিল এবং হাতে বোনা নূতন শুদ্ধ সাদা চাদর গায়ে দিয়ে দিল । সেখানে একটি নূতন তুলসী বৃক্ষ এনে রাখা হল । গলায় তুলসীর মালা পরান হল, কপালে চন্দনের তিলক দেওয়া হল । মাথার নীচে খুব নরম এবং হাল্কা একখণ্ড গীতা রাখা হল । পণ্ডিতজী বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন তাই একটি ছোট শালগ্রামশিলা তাঁর বুকের ওপরে রেখে দেওয়া হল । তারপর ধূপদীপ ইত্যাদি দিয়ে ষোড়শোপচারে ভগবানের পূজা আরতি করা হল । এরপর সোমদত্ত পণ্ডিতজীকে তুলসী আর গঙ্গাজল পান করিয়ে গীতার অষ্টম অধ্যায় অর্থসহিত পাঠ করে শোনালো । তারপর সকলে মিলে শ্রদ্ধার সঙ্গে একস্বরে ভগবানের নাম কীর্ত্তন করতে থাকল । পণ্ডিতজীর সামনে দেওয়ালে বিষ্ণুভগবানের এক ছবি টাঙানো ছিল। সেই ছবি দেখতে দেখতে ভগবানের নাম-রূপ-গুণ এর চিন্তা করতে করতে এবং ভগবানের নাম কীর্ত্তন শুনতে শুনতে পণ্ডিতজী ভগবানের পরমধামে যাত্রা করলেন।

এই কাহিনী থেকে বিশেষ করে মা বোনেদের এই শিক্ষা নেওয়া উচিৎ যে তারা যেন সুশীলাকে আদর্শ জ্ঞান করে তাকে অনুকরণ করে অর্থাৎ নিজেদের প্রতি যারা খারাপ করে তাদেরও ভাল করে। বালকদের সাথে বাৎসল্য ভাব, সমবয়সীদের সাথে মৈত্রীভাব আর বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি বিনয় ভাবে তাদের সেবা করে । নিঃস্বার্থভাবে ভাল কাজ করে অভিমানশূন্য হয়ে তার শুভফল অপরকে দেবার জন্য সত্যের ওপর দাঁড়িয়ে চেষ্টা করে ; বিষম দুর্বিপাকেও কাম, ক্রোধ, লোভ, লজ্জা, ভয়ের বশীভূত না হয়ে ধৈর্য্য, ধর্ম, ঈশ্বরে বিশ্বাস, এবং

জেনেশুনে প্রাণ ত্যাগ করার কখনও চিন্তাই না করে । শ্বশুর শাশুড়ী, মাতাপিতা, স্বামী ইত্যাদি গুরুজনদের সেবা করা কর্ত্তব্য মনে করে নিঃস্বার্থভাবে বিনয় এবং ভালবাসার সহিত শরীর, মন এবং সামর্থ্য দিয়ে তাদের সেবা করা, বালকদের নিজের আচরণ এবং বানীর দ্বারা ভাল শিক্ষা দেওয়া,ছেলেমেয়ের বিবাহে কুরীতি আর অনাবশ্যক খরচ সর্বপ্রকারে পরিহার করা, চোর, বদমাশ, ঠগ, নীচ আর ধূর্তদের থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বুদ্ধি বিবেচনাপুর্বক কাজ করে রোগ, শোক এবং বিপর্যয়ে দুঃস্থ মানুষের মঙ্গলের জন্য নিঃস্বার্থভাবে তাদের সেবা করে বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, তেজ আর শিল্পজ্ঞান বৃদ্ধির জন্য তৎপরতার সাথে যথোচিত চেষ্টা করে সকলকে নিজের করে নেবার জন্য তাদের দোষত্রুটীর প্রতি লক্ষ্য না দিয়ে তাদের গুণাবলীর প্রশংসা করে তাদের মঙ্গলের চেষ্টা করে এবং ক্ষমা, দয়া, শান্তি,সমভাব, সন্তোষ, সরলতা, শ্রদ্ধা, প্রেম ইত্যাদি গুণাবলীকে আর সৎসঙ্গ স্বাধ্যায়, কথা-কীর্ত্তন, তীর্থ, সেবা, তপ, দান ইত্যাদি সদাচারকে অমৃত সমান জ্ঞান করে কর্ত্তব্য আর নিস্কামভাবে শ্রদ্ধাভক্তিপূর্বক এগুলি হৃদয়ে ধারণ করে ।